কিছুক্ষণ

অভিক দত্ত



কিছুক্ষণ

অভিক দত্ত

আদরের নৌকা

KICHUKHKHAN
by Abhik Dutta

প্রচ্ছদঃ বিক্রমাদিত্য গুহ রায়।
প্রকাশক ও কপিরাইটঃ আদরের নৌকা
যোগাযোগঃ adorernauka@gmail.com

https ://iwrite.app

মাঝখানে আমার রাইটার্স ব্লক হয়েছিল, কিছু লিখতে পারতাম না, সেই একটা দশা থেকে বেরিয়ে এই গল্পগুলি লিখতে সক্ষম হলাম। আমার গল্প যারা আগে পড়েছেন, তারা বুঝবেন এই গল্পগুলি আগেরগুলির থেকে একেবারেই আলাদা। খারাপ ভাল আপনারা বুঝবেন যারা এই বইটি কিনলেন। আমাকে জানালে খুশি হব কেমন লাগল বইটা।

অভিক দত্ত
জানুয়ারি, ২০১৩

গল্পের তালিকাঃ

বৃত্ত

১।

“বনে বনে ওড়ে তোমার রঙিন বসনপ্রান্ত”

বিন্দিয়া যখন এই অংশটা নাচে তখন সব থেকে ভাল লাগে অরিত্রর। অফিস থেকে এসে রোজই দেখে দিদির ক্লাসে মেয়েরা নাচে। তাদের মধ্যে বিন্দিয়া যেন একটু অন্যরকম। সুনেত্রার সাথে বিচ্ছেদের পর আজকাল মেয়ে দেখলে একটু ছুকছুকানি বাড়ছে তার। সেটা সে নিজেও বুঝতে পারছে। এই মেয়েটার বয়স বেশি নয়। ভরাট যৌবন। এত সুন্দর ফিগার অনেকদিন দেখেনি সে। দেখলে অস্বস্তি হয়। উত্তেজনা আসে। ভাবতেই হেসে ফেলল অরিত্র।

এ মেয়ে তার হাঁটুর বয়সী। প্রায় বারো বছরের ছোট। রাতে ফিরে এসে দুটো বড় পেগ নাহলে আজকাল চলছে না তার। সে কি অ্যালকোহলিক হয়ে যাচ্ছে? হবে হয়ত। তাতে কার কি আসে যায়? সুনেত্রার যদি অফিসের বস প্রিয় হয় তার কেন হুইস্কি প্রিয় হবে না? এই বিন্দিয়াটা আজকাল তার নেশা হয়ে যাচ্ছে। কোন দিক থেকে যে ঢুকে পড়ছে বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু ঢুকে পড়েছে। বিচ্ছেদের পর পর সুনেত্রার চোখ বড় জ্বালাতন করত তাকে। বিন্দিয়া সে জ্বালাতন থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছে। এখন একটু নেশা হলেই বিন্দিয়ার মুখ তার কল্পনায় চলে আসে। তখন এক হাজার আলোকবর্ষের মধ্যে সুনেত্রাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এরকমই তো চেয়েছিল সে। হাঠাও বাঁশের গাড়ি। পুরনো স্মৃতিরা ভিড় না করলেই হল।

২।

শীতের বৃষ্টি এমনিতে ভাল লাগে না অরিত্রর। কিন্তু আজ লাগছিল। এক পেগ শেষ হবার পর যখন বিন্দিয়াকে বাড়িতে দিয়ে আসার কথা বলল দিদি। নরম রঙের একটা সালোয়ার পড়েছে মেয়েটা। অরিত্র গাড়িটা স্টার্ট করেই ওকে জিজ্ঞেস করল “কোথায় যেন বাড়িটা আপনার?”

মেয়েটা হাসল “আমাকে আপনি বলছেন কেন? তুমি বলুন, আমি অনেক ছোট”।

নেশার ঝোঁকে ভালই লাগছিল মেয়েটার গলার স্বর। মায়াবী। অরিত্র বলল “ছোট বলছ, আগেকার দিনে তো এই বয়সে বিয়ে হত মেয়ে ছেলের”।

একটু থতমত খেল যেন। পরক্ষণেই সামলে নিল। স্মার্ট মেয়ে আজকালকার। দক্ষিণ কলকাতার নামকরা কলেজে পড়ে। এরা এত সহজে কাবু হয় না। ওই অবস্থাটা দিব্যি সামলে নিয়ে বলল “হ্যাঁ হয় হয়ত, কিন্তু আপনি কি আমায় বিয়ে করবেন?”

নাও সামলাও এবার। গড়িয়াহাটার বৃষ্টি ভেজা রাস্তায় গাড়ি হাকাতে হাকাতে কিছুক্ষণ আগে পান করা হুইস্কিও তাকে কোন রকম সাহায্য করতে পারল না। অপ্রস্তুত হতে হল। তবু একটু সাহসী উত্তর ছুড়ল সে “কেন করব না? তোমার মত মেয়ে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার তো!” বিন্দিয়া হাসল “ভাগ্যের ব্যাপার তো বটেই। মোবাইলে প্রচুর ফোন আসে আননোন নম্বর থেকে”।

ঈর্ষা হল অরিত্রর। সুনেত্রার ফোনেও প্রচুর আসত। সে রেগে যেত। আরও রেগে যেত যখন দেখত সুনেত্রা ওগুলিকে প্রশ্রয় দিত। জিজ্ঞেস করলে বলত “কি করব? আমার সময় কাটে বেশ। আর অচেনা কোথায়? ফেসবুকে চেনা তো সব”।

অরিত্রর ইচ্ছে হত সব টান মেরে ছুঁড়ে দেয়। দিতও মাঝে মধ্যে। সুনেত্রা অভিযোগ করত অরিত্র তাকে স্পেস দিচ্ছে না। অরিত্র পরিষ্কার বলে দিয়েছিল তার ঘর করতে গেল এই ফেসবুক টুক ফোন ছেনালি করা চলবে না। তার মধ্যেই একদিন নাটকীয় ভাবে সুনেত্রা জানিয়ে দেয় মিত্রের সাথে থাকবে সে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে দিব্যি মিত্রের সাথে লিভ ইনও শুরু করে দেয়। মিত্র ওদের অফিসের বস। হ্যান্ডসাম। আর বস হবার সুবাদে সব রকম সুযোগ সুবিধাও পাওয়া যাবে। মন্দ কি। অরিত্র বাঁধা দেয় নি। মিউচুয়াল ডিভোর্স মেনে নিয়েছে। কষ্ট হত কিছুদিন। ঘুম আসত না। কিন্তু মানতে বাধ্য হয়েছে।
বিন্দিয়ার কথায় পুরনো কথা মনে পড়ে গেল। সে জিজ্ঞেস করল "ফেসবুকে কত বন্ধু তোমার?"
বিন্দিয়া চোখ বড় বড় করে বলল "৫০০০ কমপ্লিট। সাথে ১২০০০ সাবস্ক্রাইবার"।
বুঝল না অরিত্র। "মানে সাবস্ক্রাইবার মানে কি?"
উত্তেজিত হল বিন্দিয়া "মানে হল আমি যা বলব যা ফটো দেব তা আমার বন্ধু ছাড়াও ওই লোকেরা দেখতে চাইছে।"
হতাশ হল অরিত্র। তার কি হবে আর। এ মেয়েকে তো সবাই চায়।
৩।

"এগুলো বিশ্বাস হতে পারে না।
ওই যে বাড়ির পাশের গাছপালার কথা বার্তা,
বুড়োটার দেয়াল ধরে হাঁটা
কিংবা তোমার ফিরে দেখা।
পারে না।
বিশ্বাস করো।
এগুলো ফিরে আসতে পারে না..."

অফিস থেকে বেরোতে ফোন এল।
"কি করছেন"?
বিন্দিয়া।
অপ্রত্যাশিত ফোনটা। নাম্বারটা কোত্থেকে পেল কে জানে। দিদির থেকেই হবে হয়ত। হাত থেকে ফোনটা পড়ে যাচ্ছিল। কোনমতে ম্যানেজ করে তুলল "এই তো অফিস থেকে বেরলাম"।
"ফোরামে আসতে পারবেন?"
"সে তো অনেক দূর। কেন?"
"দূর? তবে থাক।" ঈষৎ ভারী শোনাল কি গলাটা?
" তুমি কোথায়? আছ?"
"এই আপনার সাথে দেখা করতে ইচ্ছা করল। ফোরাম কি অনেকদূর?"
হার্ট বিট মিস করল বোধ হয় একটা। এই বয়সে এসব হচ্ছেটা কি। একটা বিয়ে তো গেল। এখন এসব বুক ধড়াস ধড়াস হবার তো কথা নয়। একটু হাসতে চেষ্টা করল সে। "আচ্ছা তুমি রুবির দিকে আসতে পারবে? তাহলে তোমায় গাড়িতে পিক আপ করে নিতাম"।
ওপাশে গলাটা একটু উচ্ছল হল "আচ্ছা তাই আসুন, দেরী করবেন না যেন। দিদির ক্লাস আছে সাতটায়"।

হাসল অরিত্র "হ্যাঁ হ্যাঁ, একসাথেই বাড়ি ফিরব না হয়"।

৪।

“তোমাকে ফোন করলে পাওয়া যায় না আজকাল।“
“তাতে তোমার কি ছেঁড়া গেল?”
“তোমাকে অনেকদিন বলেছি আমাকে গালাগাল দিয়ে কথা বলবে না।“
“এই তুই কি আমার বউ? যখন ছিলি তখন সম্মান দিয়েছি। ইউ বিচ। আরও গালাগাল দেব তোকে। খানকি মাগী। ভাল ছেলে দেখে চলে গেলি আমাকে ছেড়ে। তুই কি ভেবেছিলি আমি ঘরে বসে ফেলব?”
“শিট। এসব কি বলছ তুমি? কি হয়েছে তোমার?”
“প্রেম হয়েছে। বুঝলি? তোর মত ছেনালি মাগির সাথে না। ভাল মেয়ের সাথে। তোর মত আমাকে ছেড়ে যাবে না। ফোট ফোট শালী”।
সুনেত্রা ফোন করলে এভাবেই কথা বলবে ঠিক করে রেখেছে অরিত্র। কোনদিন ফোন করে না সে। এরকম হৃদয়হীন হতে পারে কেউ সুনেত্রার মত?

৫।

“একটা ফুল দিও
আর একটা গন্ধ
একটা ভালবাসা
আর কিছু শব্দ।
তোমার চোখে দিও
ইচ্ছের কারুকার্য
আমার ঠোঁটে দিও
নোনা পাতার আস্বাদ”।

বিন্দিয়ার পিঠে মুখ ঘষতে ঘষতে অরিত্র ডুবে যাচ্ছিল এক তৃপ্তির মধ্যে। আহত পুরুষ তার বহুদিনের অব্যবহৃত পুরুষত্ব প্রমাণের সুযোগ পেয়েছে। বিন্দিয়ার ঊরুসন্ধি, নাভি, স্তনে সে আগুন জ্বালাচ্ছিল। বিন্দিয়ার শীৎকার তার আগুনে ঘি যোগান দিচ্ছিল। অনেকদিন পর পৌরুষ প্রমাণের সুযোগে হোটেলের ঘরে বিন্দিয়াকে জয় করল সে।
অনায়াসে।

৬।

সুনেত্রার সাথে দেখা হল তার। বহুদিন পরে। হাইল্যান্ড পার্কে। বিন্দিয়াকে নিয়ে বেরচ্ছিল সে। দুজনকে এক সাথে দেখল সুনেত্রা। ভাবলেশহীন ভাবে একবার তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল। অরিত্র আরেকটু বেশি আশা করেছিল। সে এগিয়ে গেল। হাসল গিয়ে। “কেমন আছ?”
সুনেত্রা বিন্দিয়াকে দেখে হাসল “ভাল তুমি কেমন?”

অরিত্র সুনেত্রা কে জ্বালানোর উদ্দেশ্যে বলল “এ হল বিন্দিয়া। লাস্ট মাসে বিয়ে করেছি। ফেসবুকে ওর ৫০০০ বন্ধু, ১৪০০০ সাবস্ক্রাইবার”।
সুনেত্রা অবাক চোখে তার দিকে তাকাল। বিন্দিয়া অরিত্রর কথা শুনে লজ্জা পেল একটু। বলল “এই তুমি চুপ কর তো। কিসব বলছ”।
অরিত্র বিন্দিয়ার দিকে তাকাল হাসি মুখে “তুমি একে চেন? আমার আগের বউ। আমাকে ছেড়ে দিয়ে গেছিল ওর বসের সাথে থাকবে বলে”।
দুজনই অপ্রস্তুত হল। অরিত্র বিন্দিয়ার হাত ধরে গটগট করে এগিয়ে গেল। সুনেত্রা বিড়বিড় করল “সিক। কমপ্লিটলি সিক”।

৭।

বিন্দিয়া বাপের বাড়ি গেলে বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে অরিত্রর। সুনেত্রার বাপের বাড়ি কেউ থাকত না। বাপ মা মরা মেয়ে। তবে ও থাকলেও সারাদিন কম্পিউটার আর আননোন কল নিয়ে ব্যস্ত থাকত। বিন্দিয়া সারা রাতে একবার বসে। আর আননোন কল বিয়ের পর রেস্পন্ড করে না। অরিত্র সুখী।

৮।

“হ্যালো, আপনি কি মিস্টার অরিত্র ঘোষাল বলছেন?”
“হ্যাঁ বলছি। কে বলছেন আপনি?
“আমি শিবপুর থানা থেকে বলছি। আপনার স্ত্রী কি মিসেস বিন্দিয়া ঘোষাল?”
“হ্যাঁ। কেন কি হয়েছে?”
“উনি আর ওনার এক বন্ধু গাড়ি করে কোন একটা জায়গা থেকে ফিরছিলেন। রাত দুটো নাগাদ ওনাদের গাড়ি প্রচন্ড গতিতে একটা ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। দুজনেই হস্পিটালাইজড।“
“আরেকজনের নাম কি?”
“রাজর্ষি চ্যাটার্জি। আচ্ছা উনি কি আপনার পরিচিত।“
“না”। ফোনটা নামিয়ে রাখল অরিত্র।

৯।
দিদি কাঁদছে। “তুই মন খারাপ করিস না। তোর কপালটাই খারাপ। কি করবি বল?”
অরিত্র পাষাণের মত বসে রইল। জবাব দিল না কোন।

১০।
“এক অলস বিকেলে
একটা ভালবাসার মৃত্যু হয়।
আধমরা সরীসৃপের মত
ভালবাসারা হেঁটে বেড়ায় তোমার চারপাশে...”

শোনা যায় অরিত্রের মৃতদেহ দেখে ফেরার সময় পাড়ার লোকেরা মুখ টিপে হেসেছিল।

ছুটি

আজ আমাকে লিখতে বলা হয়েছে। কিন্তু লেখার আগে আমাকে এও বলা হয়েছে আমি আগের কথা যেন কিছু লিখি। আমার কি হয়েছিল, কি করলাম সব। চেষ্টা করছি যা মনে আসছে লিখতে।বেশি গুছিয়ে লিখতে পারি না আমি।

আমি ছেলেটা ভীষণ ভাল ছেলে। কেউ আমাকে খারাপ কিছু বললে, আমাকে খ্যাপালে আমি তাকে কিছু বলতে পারি না। কোথায় যেন বাঁধে। আমি অফিস যাই ভাল ছেলের মত। আমার বউ আমাকে টিফিন দিয়ে দেয়। পাঁচতলা স্টিলের টিফিন বাক্স। তার দুটো তলায় ভাত থাকে। একটা তলায় থাকে মাছ বা ডিম, একটায় তরকারি, একটায় ডাল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাতে টিফিনের ব্যাগ নিয়ে দশ মিনিট হাঁটি। তারপরে বাস ধরি। ভিড় বাসে আমার হাতে টিফিন বাক্স দেখে কেউ কেউ বাজে কোন ব্যঙ্গ করলে আমি না শোনার ভান করি।

কোনভাবেই আমি লেডিস সিটের কাছাকাছি দাঁড়াই না। কনুইয়ের পাশে ভাল বুক পেলে আমার কনুই কোনদিন ওঠে না। অফিসে রোজ টাইমে পৌঁছোই। বস আমাকে ভীষণ ভালবাসেন। তিনি আমাকে যতক্ষণ বলেন আমি ততক্ষণ কাজ করি। অফিসের সবাই বাড়ি চলে গেলেও আমি কোনকোনদিন দশটা পাঁচটার অফিসে রাত আটটাও বাজিয়ে ফেলি। আমার বউও কোন অনুযোগ করে না। যেদিন দেরী হয়ে যায় দেখি চুপচাপ বসে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে গরম জল করে দেয়। আমি হাত পা ধুয়ে খবরের কাগজ নিয়ে বসি। ও আমার জন্য মুড়ি এনে দেয়, আমার বিলাসিতা বলতে গরম মুড়ি চানাচুর। একটা ঝাল লঙ্কা।

আমার বিয়ের পাঁচবছর হয়ে গেলেও কোন ছেলে মেয়ে হয়নি। কিন্তু আমার যৌন জীবন স্বাভাবিক। রাতে শোবার পরে বিয়ের শুরু শুরুতে রোজই বউকে জড়িয়ে ধরতাম। এখনও দু তিন দিন পর পর আমরা মিলিত হই। কিন্তু এখনও কোন বাচ্চা হল না। আমার দেশের বাড়িতে মা থাকে। বাড়ি গেলে মা বউকে আলাদা করে ডেকে কিসব কথা বলে। আমি জানি না কি বলে। তবে বুঝতে পারি এ সংক্রান্তই কিছু। বউ মাথা নিচু করে উত্তর দেয়। মা কিছু পরে ইতস্তত করে আমাকে ডাকে। জিজ্ঞেস করে বউমার সাথে আমি ঝগড়া টগরা করি নাকি।

আমি ভাল ছেলের মত উত্তর দিই। ডাক্তার দেখানোর কথা বলে মা। আমি তাও দেখাই। ডাক্তার সব দেখে শুনে কত রকম পরীক্ষা নিরিক্ষা করে বলে দুজনই ঠিক আছে। এরকম তো হবার কথা নয়। বউ মাথা নিচু করে শোনে। আমি মাথা নিচু করে শুনি। কেউ কোন কথা বলি না। ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে ভাল হোটেলে যাই। রুটি মাংস খেয়ে দুজনে বাসে উঠে বাড়ি আসি।

অফিসে আমি দু একদিন ছুটি নিলে সহকর্মীরা বিরক্ত করে। কেউ কেউ বলে “কি দাদা, কিছু হবে হ্যাঁ?” আমি হাসি। তাতে তারা আরও সন্দিগ্ধ হয়। আমি একটু চুপচাপ থাকি বলে তারা আমাকে মাঝে মাঝেই বড্ড উত্ত্যক্ত করে। আমি হাসিমুখে শুনি। কেউ কেউ আমার চেয়ারে চুইং গাম লাগিয়ে রাখে। আমার প্যান্ট চ্যাট চ্যাট করে। আমি কিছুই বলি না। বস আমাকে পছন্দ করে বলে এরা বেশি ঘাটায় না আমাকে। তবে ঈর্ষাও করে। আমাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলে “আমাদের তো ভাই ঘর সংসার আছে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো সম্ভব না, আমরা ভাই ও সব পারব না। অত তেল মারামারি ভাই আমাদের দ্বারা হবে না”। আমি সবই বুঝি ওরা আমার রাত করে থাকার ব্যাপারটা নিয়ে আমাকে টোন করছে। তবু আমি কিছু বলি না।

আমি চিরকালই লাজুক স্বভাবের। নিজেকে জাহির করতে পারি না। বাথরুমে হলেও আমি ভাল গান গাইতে পারি। কলেজে যখন পড়তাম কত অগা বগা দেখতাম একটু গান করতে পারলেই বন্ধুমহলে কত রকম কায়দা করত। আমি রোজই ভাবতাম গান শোনাব ওদের। কিন্তু কোনদিনই পারিনি। রাতে শুয়ে শুয়ে কল্পনা করতাম, হঠাৎ দু লাইন গুনগুন করেছি, কেউ শুনে বলে ফেলবে, বাঃ, সুরথের তো দারুণ গলা রে। কিন্তু বাস্তবে আমি কোনদিনই গাইতে পারলাম না সবার সামনে।
অফিসে চাকরিটাও পেলাম হঠাৎ করে। এ চাকরিটা আমার পাবার কথা না। এই অফিসে আগে আমার বাবা কাজ করত। এই অফিসে একটা আইন ছিল চাকুরিরত অবস্থায় কেউ মারা গেলে তার ছেলে মেয়ে অথবা স্ত্রী চাকরি পাবে। আমাদের বাড়িতে বাবা মারা যাবার পরে অফিস থেকে চিঠি এসে পড়েছিল দীর্ঘদিন। আমরা কেউই দেখিনি। একদিন মা ঘর ঝাড় দিতে গিয়ে খুঁজে পেল। হয়ত আমাদের কাজের লোক চিঠিটা পেয়ে আমাদের দেয় নি। আমি তখন বি এ পাস করে বেকার। চাকরির কোন আশাই ছিল না। চিঠিটা পেয়ে মা আমায় বলল বাবু শিগগির যা। কালই যা। আমি আবার একটু অলসও বটে। ইচ্ছা করছিল না যেতে। সেদিন কলকাতা যাবার নাম করে কলকাতা ঘুরে চলে এলাম। মা জিজ্ঞেস করল কিরে হল? আমি বললাম কাল যেতে বলেছে। এরকম আজ কাল করে করে সাতদিন পরে গেলাম। এখন আমাদের যিনি বস, ইনি ছিলেন তাঁর বাবা। আর দু তিন মাস পরে তিনি ছেলের হাতে সব দিয়ে ঘরে বসে যান। আমি যেতে আমায় দেখে বললেন “তুমি প্রদীপের ছেলে?” আমি মাথা নাড়লাম। উনি চেঁচিয়ে বললেন “কথা বলতে পার না নাকি? বোবা কি তুমি?” আমি বললাম “হ্যাঁ পারি। আমি প্রদীপের ছেলে”। উনি আমার কথায় হেসে ফেললেন। বললেন “এতদিন কোথায় ছিলে?”
আমি মিথ্যা করে বললাম আমার মা যেটা শিখিয়ে দিয়েছিল “আমার কাছে চিঠি এসেছে তিন দিন আগে”। উনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন “ঠিক আছে, প্রদীপের সুনামে তোমাকে নেওয়া হল আশা করব তুমি সে সুনাম রাখবে”।
আমার বাবা আমাদের মফস্বল থেকে যাওয়া আসা করত। আমি দু একদিন ডেলি প্যাসেঞ্জারির চেষ্টা করে দেখলাম এ আমার দ্বারা হবে না। মাকে বললাম। মাও বলল কলকাতায় যদি একটা ঘর পাওয়া যায়। তারপর মা বলল একা একা কি খাবি না খাবি একটা বিয়ে কর। মা-ই মেয়ে টেয়ে সব দেখে দিল। চাকরিতে জয়েন করার তিন মাসের মধ্যে আমার বিয়ে হল। আমাদের স্টেশান থেকে তিনটে স্টেশান বাদে আমার শশুরবাড়ি। বাসরঘরে বউকে কিছু করি নি। তার আগে স্কুল লাইফে বা কলেজে সব ছেলেরা যখন যৌন মিলনের বইটই দেখত আমি ওসব থেকে দূরেই থাকতাম। বাসরে ঢোকার আগে আমাকে কয়েকজন বন্ধু অনেককিছু শিখিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বিয়ের পরে আমি কিছুই পারি নি। বউকে বললাম তুমি কোনদিকে শোবে। ও গুটিসুটি মেরে ছিল। ভেবেছিল হয়ত আমি গিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ব। চুপচাপ বলল তুমি শোও না যেদিকে শোবে। আমি ক্লান্ত ছিলাম। শুতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। আমার সে অর্থে বাসর হয়েছিল ওদের বাড়ি গিয়ে দ্বিরাগমনে। পাঁচ দিন কিছু না করে রোজই ভাবতাম কিছু করতে হবে। শেষে ওদের বাড়িতে ও শোয়ার পর ওকে গিয়ে জড়িয়ে ধরি। অনেকক্ষণ ধরে পরস্পরের শরীর আবিষ্কার করে যখন ঘুমোই সেদিনটা আমি কখনও ভুলি নি। তারপর থেকে এটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। এখনও সেরকমটাই আছে।
এই নতুন বস আসার পরে আমার ভাল হয়েছে কি খারাপ হয়েছে জানি না। আমার দুটো ইনক্রিমেন্ট দিয়েছে তাড়াতাড়ি। কিন্তু যেহেতু আমি সাত চড়ে রা কাড়ি না এবং ছুটি ছাটা বস বললে ক্যান্সেল করে দিই তাই ভালবাসা আমার প্রতি যেন বেশিই বেড়েছে। শুধু আমার বাড়ি ফিরতে রাত বেশি হয়ে যাচ্ছে।
আমার অফিসে আমার বন্ধু বলতে একজনই আছে। অর্ণব। ওকে অন্তত কখনও দেখিনি আমার নামে কিছু বলতে। ও প্রায়ই বলে অফিস শেষের পরে একটু মদ টদ খেতে। আমি মদ খাই না। তবে যেহেতু আমি ভীষণ ভাল ছেলে আর কাউকে না বলতে পারি না অর্ণবের জোরাজুরিতে না করতে পারলাম না। ও নিয়ে গেল আমাকে একটা বারে। বারে আমি এর আগে কোনদিন যাই নি। অন্ধকার অন্ধকার ঘর। একটা মদ মদ

গন্ধ। মদের গন্ধ আমি আগে পেয়েছি। আমার বাবা মদ খেয়ে আসত মাঝে মধ্যে। মার সাথে তখন ঝগড়া লাগত। আমি চুপ করে দেখতাম। খুব ভয় লাগত তখন। এখানে দেখি সেই গন্ধ। অর্ণব একটা চেয়ারে বসিয়ে বলল হুইস্কি খাবি? আমি তো কিছুই বুঝি না। বললাম যা তুই খাবি সেটাই বল। কি একটা নাম বলল ও বেয়ারাকে। কাঁচের গ্লাসে করে দিল। সামনে চানাচুর। আমি চানাচুর বেশি করে খেতে লাগলাম। অর্ণব সোডা জল ঢেলে দিল আমায়। এক ঢোক খাবার পর একটু কেমন লাগল। তাড়াতাড়ি সব খেয়ে নিলাম। অর্ণব হাসতে লাগল। বলল পাগল, এই ভাবে খায় কেউ?
সেদিন রাতে বাড়ি ফিরতে লজ্জা লাগছিল। তবু ফিরলাম। বউ আমার দিকে তাকিয়ে বুঝল। চুপচাপ খেতে দিল। খেয়ে দেয়ে আমার আর হুঁশ ছিল না। মরার মত ঘুমালাম।
সমস্যাটা হল পরের দিন অফিসে পৌঁছে। কাজ করতে করতে তিন চারবার পায়খানায় ছুটতে হল। অফিসের রিসেপশনিস্টের কাছে ওষুধ থাকে। আমায় একটা কড়া antibiotic দিল। খেয়ে আমার আরও শরীরটা খারাপ লাগছিল। জীবনে যেটা করিনি সেটা করতে বাধ্য হলাম। বসকে বলে বাড়ি ফিরলাম।
বাড়ি ফিরে দেখি ঘরের দরজা বন্ধ। অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর বউ এসে দরজা খুলল। আমায় দেখে মনে হল একটু ঘাবড়ে গেছে। আমার কি একটা সন্দেহ হল যে সন্দেহটা আমার কোনকালে ছিল না। আমার ঘরে একটা ভাঁড়ার ঘর মত আছে। আমি দৌড়ে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকলাম। ঢুকতেই দেখি একজন ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। আমারই বয়েসী। আমি একে শ্বশুরবাড়িতে দেখেছি। কি করব বুঝতে পারছিলাম না। আমি চিরকাল মারপিট ঝুট ঝামেলা থেকে দূরে থাকা লোক। চুপচাপ ঘরে গিয়ে বসলাম। বউকে কিছু বললাম না। ছেলেটাকেও না। শরীরটা খারাপ লাগছিল। ঘুমিয়ে পড়লাম।
আমার ঘুম ভাঙল গভীর রাতে। ঘুম থেকে উঠে দেখলাম পাশে বউ ঘুমিয়ে আছে। আমার অদ্ভুত লাগছিল। একটা শীত শীত ভাব। তার সাথে একটা রাগ। এত রাগ আমার কোনদিন হয় নি। আমি মেয়েলি ব্যাপার বুঝি কম। তবে এটুকু বুঝতে পারছিলাম কেন আমার বাচ্চা হচ্ছিল না। বউ নির্ঘাত কোন ওষুধ খাচ্ছিল। আলমারির ভেতর ওর লকার কোন কালে ধরি না। আলমারিটা শোয়ার ঘরে থাকে না। বসার ঘরে থাকে। আমি ধড়মড় করে উঠে ওর লকার খুলে দেখলাম এক গাদা ওষুধ। বুঝতে পারলাম এগুলিই সেই ওষুধ। আমার কি হল জানি না, আমি সে রাতে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মিটসেফ থেকে দাঁ বের করে বউকে কোপালাম। আমার এটুকু মনে আছে কোপানোর সময় আমি খুব শব্দ করে চিৎকার করছিলাম আর কাঁদছিলাম। আমার হাতে নাকে মুখে রক্ত ছিটকে ছিটকে এসে লাগছিল। আমার তা সত্ত্বেও কোন জ্ঞান ছিল না। আমার চিৎকার শুনে পাড়ার লোক জড়ো হয়ে যায়। সবাই দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে সব দেখার পর আমার উপর সবাই কিল চড় ঘুষি যা পারে মারতে শুরু করে। তারপরে আর আমার কিছু মনে নেই।
আজ সকালে আমার জ্ঞান ফিরল। আমি এখনও কিছু কথা বলতে পারছি না। চেয়ে দেখছি সামনে ডাক্তার নার্স সব ঘুরে বেড়াচ্ছে। একজন ডাক্তার মত লিখে দিল আমার সম্পর্কে সব জানাতে। এখন আমার এর চেয়ে বেশি কিছু মনে পড়ছে না। আমার বাবার নাম মায়ের নাম ঠিকানা মনে আসছে। কবে বিয়ে হয়েছিল বউয়ের নাম মনে আসছে। কিন্তু এখন যা লিখলাম এর চেয়ে বেশি কিছু মনে আসছে না। মাথা বড্ড ব্যথা করছে।

আমার মা এসেছিল লেখার সময়। মনে হল কাঁদছিল। ডাক্তার জোর করে নিয়ে গেল মাকে। পুলিশও ছিল সাথে। আমি জানি আমি যা করেছি তাতে আমার ফাঁসি বা জেল কিছু একটা হবেই। কিন্তু আমি এটুকু জানি, সেদিন যখন পাড়ার লোক আমায় যথেচ্ছভাবে মারছিল তখন বউয়ের রক্ত আমার রক্তের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছিল। সেই রাগটা সেদিন এসেছিল। সেদিনই চলে গেল। এখন আমি আবার ভাল ছেলে। কাল যদি আমি অফিস যাই, আবার বস যদি বলে রাত আটটা অব্দি থেকে কাজ করে যেতে আমি করব। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে যদি দেখি বউ গরম জল করে দিয়েছে সেই জলে পা ধোব। এখন বউয়ের মুখটা

খুব মনে পড়ছে। জানি না কেন। আর লিখতে পারছি না। খুব ঘুম পাচ্ছে। এবার অন্তত ওরা আমায় মার সাথে দেখা করতে দিক...

কিছুক্ষণ

-তুমি কি রাজনীতি কর?
-কেন?
-না তোমার দাড়ি দেখে মনে হচ্ছে।
-দাড়ি রাখা কি খারাপ?
- তা না, তবে প্রথমদিন কোন মেয়ের সাথে দেখা করতে এলে দাড়ি কেটেই আসা উচিত।
-তাই নাকি? তা কটা ছেলের সাথে দেখা করেছ শুনি?
-তুমি তিন নম্বর। কি হল মুখটা ঝুলে গেল কেন?
- ইয়ে না মনে সেটা তো বলনি?
-বলার কি আছে? তুমি যে আঁতেলদের মত দাড়ি নিয়ে এসছ সেটা নিয়ে বলি তবে? ফেসবুকে ফটো দেখে তো মনে হচ্ছিল দুর্গাপুত্র কার্ত্তিক পুরো। তা না কোত্থেকে এক গাল দাড়ি নিয়ে চলে এসছে।
-তা তুমি যে আগের দুবার এসছিলে কার কার সাথে দেখা করেছিলে?
- দুটোই ঢ্যাঁড়শ। একটা ঋদ্ধি ব্যানার্জি যে শখের কবিতা লেখে আরেকজন তমাল শূর। একটাকে দাদা আরেকটাকে ভাই পাতিয়ে নিয়েছি। কবিতা টবিতায় বাপু আমার অ্যালার্জি আছে।
-ও।
-অ্যাই তুমি কবিতা লেখ না তো?
- না। একেবারেই না। ছোটবেলায় লিখতাম।
-লিখতে? যাঃ।
-যাঃ কেন?
-তারমানে ভবিষ্যতে লেখার চান্স আছে!
-না না, তোমার মত মেয়ে দেখলে কেউ কবিতা লেখে?
-মানে? মানেটা কি? আমার মত মেয়ে মানে কি?
-না মানে তোমাকে দেখেও তো বোঝা যায় একদম কঠিন কঠোর গদ্য পুরো, কবিতার কোন চান্সই নেই।
-হুম। তা কি ভেবেছিলে শুনি আমার ব্যাপারে?
- তোমায় তো সেরকম লাগেনি। মিষ্টি মিষ্টি ছবি শেয়ার করতে, রোম্যান্টিক গান কোট করতে, ভাবতেই পারিনি যে তুমি এত কাঠখোট্টা টাইপ বেরবে।
- ও আচ্ছা। ঠিক আছে। তা এখানে দাঁড় করিয়ে রাখবে না কোথাও বসবে?
-না চল ওই ওখানটা গিয়ে বসি?
-এমা না।
-কেন?
-ওদিকটা দেখছ না সব চুমু টুমু খাচ্ছে? ওদিকে যাব না।
-উফ, এত মহা বিপদে পড়া গেল। চল তাহলে ওই চায়ের দোকানটা গিয়ে বসি।
-হ্যা চল।
-হ্যা এবার বল।

-আমি কিন্তু চা খাই না। কফি খাই।
-আচ্ছা ঠিক আছে।
-তুমি তো চাকরি কর না?
-হ্যা। ক্লারিকাল পোষ্ট।
-ও তারমানে মাইনে কড়ি সেরকম পাও না?
-ওই চলে যায় ছোট সংসার।
-কে কে আছে তোমার ছোট সংসারে?
-মা, দিদি আর আমি।
-দিদির বিয়ে হয়নি?
-হ্যা, সামনের এপ্রিলে, সব ঠিক হয়েই আছে।
-সেকি, সেটা তো বলনি?
-সব কথা ফেসবুকে বলা যায় নাকি? আচ্ছা তুমি আমায় এত প্রশ্ন করছ কেন? আমার প্রেমে পড়লে নাকি?
-তোমার প্রেমে। ফুঃ। পাগল নাকি?
-অ। তা ভাই বেরাদার বানানোর ধান্দা করছ নাকি? আমি কিন্তু নেই তাহলে। ভাই বানিয়ে গিফট বাগানোর চেষ্টা করলে আমি ওয়াক আউট করব।
-বাঃ। তুমি তো বেশ মজার কথা বল। গুড সেন্স অফ হিউমার।
-হুম। তোমার জীবনে প্রেম ছিল এর আগে?
-আমার বয়স প্রায় তেইশ হতে চলল। এম এ সেকেন্ড ইয়ার পরীক্ষা দেব। তার ওপরে দেখতে সুন্দরী। আমার প্রেমিক থাকবে না তো কার থাকবে?
-ক'জন?
-ওই খান তিনেক ছিল। প্রথমটা ক্লাস সেভেনে ছিল। পাড়ার ম্যাথসের টিচারের কাছে পড়তে আসত। আমি বাড়ি থেকে বেরোলে দাঁড়িয়ে থাকত। পাশাপাশি বসতাম। মাধ্যমিক অবধি চলল। তারপর ছেলেটা যখন ব্যাক পেল ওই অঙ্কেই আমি ছেড়ে দিলাম। ফেল করা ছেলে আমার দুচোখের বিষ।
-বাহ বেশ তো। ছেলেটার তোমার জন্য পড়াশুনা নষ্ট হল, আর তুমিই ওকে ছেড়ে দিলে?
-কে বলল আমার জন্য নষ্ট হল। বড়লোকের বিগড়ে যাওয়া টাইপ ছেলে ছিল। স্কুলের সেক্রেটারি ছিল ওর বাবা। প্রতি ক্লাসে ফেল করলেও টিচাররা তুলে দিত। মাধ্যমিকে আর কে তুলবে? ব্যাক পেয়ে গেল।
-অ। আর বাকি দুজন?
-ক্লাস টুয়েলভ থেকে বি এ সেকেন্ড ইয়ার একজন। আমার ফিলসফি টিচার। ওর বাড়িতে গিয়ে পড়তাম। একদিন দোলের দিন বিকেলে গেছি। আমার মুখে রঙ দিয়ে দিল। সেই আমার শরীরে প্রথম কোন পুরুষ হাত দিল।
-তারপর?
-এত উত্তেজিত হবার কিছু নেই। গল্পের নায়িকা ভার্জিন হতে হবে এটা তোমার মিড এইট্টিজের বাংলা আর হিন্দি সিনেমায় হত। হ্যা। উই ডিড হ্যাভ সেক্স। ওর বাড়িতে কেউ ছিল না। হয়ে গেল। তারপর ও চাকরি পেয়ে স্টেটসে চলে গেল। তারপর কোন যোগাযোগ নেই।
-হুম। তারমানে ওই সেক্সটা করার জন্যই প্রেম করেছিল।
-জানিনা। আমি ওরকম টাইপ মেয়ে নই যে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসবে আমার সকল নিয়ে চলে গেল। এক মাস মন খারাপ ছিল। মনটা এই জন্যই খারাপ ছিল যে সে ব্যাটা আমাকে এত ইমোশনালি ঠকিয়ে গেল। যদি সেক্স করতেই হত, সোনাগাছি যা। কেন প্রেমের নামে এই ফ্রডগুলি করলি? যাকগে, তার ছ'মাস বাদে

এক চ্যাংড়া প্রোফেসর প্রেম নিবেদন করল। প্রথম প্রথম ন্যাকা ন্যাকা কথা বলত। তারপর একদিন সিনেমা হলে নিয়ে গিয়ে বুকে হাত দিতে গেল।

-তারপর?

-তারপর আমি ভদ্রভাবে বললাম, এসব করতে গেলে চাঁদ, বিয়ের পর কোর। জিজ্ঞেস করল কেন। আমি সব বললাম জীবনে দ্বিতীয়বার চার অক্ষরের বোকা হতে রাজি নই।

-হা হা।

-হ্যাঁ। পরে আমারও হাসি পেয়েছে। কিন্তু তখন সিরিয়াস ছিলাম। আমার এইসব কথা দেখে ব্যাটা ঘাবড়ে গেল। এড়িয়ে এড়িয়ে চলল।আমিও বুঝে গেলাম ব্যাটা ভেড়ার বাচ্চা।

-উফ। তোমার মত মেয়ে আমি জীবনে একটাও দেখিনি। তোমার প্রেমে পরে গেলাম।

-ওই ডিশিসানটা আমি দেব। সেরকমই কথা হয়েছিল।

- হ্যাঁ। তারপর দুই ফেসবুক পুঙ্গবের গল্পটা বল।

-গল্প আর কি। ফেসবুকটা হল যত মেয়েবাজ ছেলেদের আড্ডা। কয়েকটা তো আবার দেখলাম রীতিমত বিবাহিত লোক কুমার সেজে গল্প করে বেরোচ্ছে। তা ওই ঋদ্ধি আমায় কবিতা মেসেজ করত। কয়েকটা রবি ঠাকুরের কবিতা কয়েকটা জীবনানন্দের কবিতাও পোষ্টও করত। ভাবত আমি বুঝি কিছুই বুঝি না। আমিও ন্যাকা ন্যাকা ভাবে উত্তর দিতাম, মেনি থ্যাঙ্কস ইত্যাদি।

-সে সেটা তুমি ভালই পারো।

-শাট ডাউন। আগে আমায় বলতে দাও। যখন দেখা করতে এল সামনে বসে খালি সিগারেট ফুঁকে যাচ্ছে আর কি সব নাম আউড়ে যাচ্ছে। কবে রবীন্দ্রনাথ বউদির সাথে শুয়েছিল কি করেছিল এসব।

-উফ... যাতা।

-হ্যাঁ। ওসব শুনে আমার আক্কেল গুরুম। বললাম, ভাই আমার না কোন দাদা নেই। আপনাকে দেখে আমার দাদা বলতে ইচ্ছে করছে। সে তো বিষম টিসম খেয়ে একাকার। আমিও বললাম বাড়িতে মা পাটিসাপটা বানাবে, সাহায্য করতে হবে, বলে কেটে পড়লাম। ফেসবুকে অন হলে এখন আর বেশি ভাটায়না মালটা।

-আর সেকেন্ড জন। কি নাম যেন বলেছিলে?

-তমাল। তমাল শূর। ইঞ্জিনিয়ার। ব্যাটা ভালই ছিল। চাকরিও পেয়েছিল বাইরে। আমি যখন বললাম আমি কলকাতা ছেড়ে কোথাও যাব না তখন দেখলাম মিইয়ে গেল।

-ও তার মানে ওকে পছন্দ ছিল?

-হিংসা হচ্ছে? না পছন্দ সেরকম ছিল না। আমার থেকে বড় বেশি হাই ফাই হয়ে যাচ্ছিল। একটু কম্প্যাটিবল না হলে হয়? বড়লোক বাড়ির ছেলে। এদিক সেদিক দেখে চাপ নিলাম না। ভাই বানিয়ে ফেললাম। আমি কিন্তু চিনি কম বেশি খাই। আড়াই চামচ দাও।

-বাব্বা। এত চিনি খাও কেন? সুগার হবে তো?

-লোকজন বলছে আমার মধ্যে মিষ্টত্ব কমে যাচ্ছে। তাই একটু ট্রাই করছি আর কি।

-তা তোমায় ফটো দেখে আর কথা বলার আগে কিন্তু বুঝি নি যে তুমি রামগোপাল বর্মা কি আগ।

-হিহি। আমি কিন্তু একটু পাগলিও আছি জানো? বৃষ্টিতে ভিজি পাগলের মত।

-সেকি? শীতকালেও?

-অতটা স্ক্রুও ঢিলা নেই। খুব গরম টরম পড়ার পর যখন ঝুম বৃষ্টি নামে তখন ভিজি।

-এটা কিন্তু কমন কেস। মেয়েরা তো আসলে ছেলেদের থেকে একটু আঁতেল বেশি হয়। ওই বৃষ্টি ট্রিস্টি পড়লে অনেক সিনেমাতেও দেখা যায় হাত ফাত ছড়িয়ে ভিজছে।

-সে হতে পারে। ওটা সিনেমাতেই দেখবে। ম্যাক্সিমাম বৃষ্টি হলে জানলা দিয়ে হাত বের করে। ঝুম হয়ে ভেজে বেশি না। যারা ভেজে তারাই পাগলী।

-সন্ধেবেলা ঝগড়া হবে, হবে দুই বিছানা আলাদা
হপ্তা হপ্তা কথা বন্ধ মধ্যরাতে আচমকা মিলন
পাগলী, তোমার সঙ্গে ব্রহ্মচারী জীবন কাটাব
পাগলী, তোমার সঙ্গে আদম্ ইভ কাটাব জীবন

-বাব্বা। চমকে দিলে একেবারে। একেবারে জয় গোঁসাই আউড়ে দিলে যে! তোমায় দেখলে তো মনে হয় না পেটে পেটে এত।

-হ্যাঁ ওই আর কি। একটু আধটু চর্চা করতাম। তোমার তো আবার এ সব পছন্দ না।

-ব্যাপারটা হল আমি নিজে কবিতা পড়ি কিন্তু ওই দাড়ি রেখে, ব্রণ রেখে, ঝুল পাঞ্জাবী পরা কবি আমি এক্কেবারে দেখতে পারি না। কিন্তু তোমার মত এই যে সাধারন সাজপোশাকের লোকজন দুম দাম এত সুন্দর আবৃত্তি করে দিলে আমার বেশ লাগে। তবে ওই দাড়িটা কেটে আসবে নেক্সট দিন।

-তারমানে আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট দিন?

-চিন্তা করে দেখলাম দেখা করাই যায়। তবে এখনও চিন্তা ভাবনা কোর না। আমি কিন্তু ভার্জিন না সেটাও মনে রেখ। বুঝলে মিস্টার সায়ন্তন দত্ত?

-সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নিলাম।

-আচ্ছা, সেদিনও "রাষ্ট্রে" একটা কবিতা পড়লাম যেন সায়ন্তন দত্তের, বেশ দারুণ অন্যরকম কবিতা। আমার এতক্ষণ মনে হচ্ছিল না। তুমি ব্যাটা সেই সায়ন্তন নও তো?

-ওই একটা লিখে পাঠিয়েছিলাম বেরিয়ে গেছে দেখলাম।

-ওহ্ গুরু। যা তা তো। আমি তবে একজন উঠতি নামকরা কবির সাথে এতক্ষণ ভাটালাম। কিন্তু ফেসবুকে এসবের উল্লেখ করনি কেন? একটা কবিতা "রাষ্ট্রে" বেরোলে তো পাবলিক যত লোক ফ্রেন্ডলিস্টে আছে সবাইকে ট্যাগ করা শুরু করে, পারলে রিক্সা করে মাইক নিয়ে বেরোয়। সেটা করলে না কেন? আমার না কেমন একটা লাগছে। ঈশ তোমাকে অনেক কিছু বলে দিয়েছি। সরি সরি।আর তখন যে বললে কবিতা লেখ না?

-হা হা। ঠিক আছে। তোমার জন্য সব কিছুই করা যায়।তুমি যেরকম কবিদের উপর ক্ষেপে ছিলে তাতে আর বেশি রিস্ক নিইনি। আমি দাড়িটা রেখেছিলাম ওই কবি লুকসটা আনার জন্যই কিন্তু যা বুঝলাম ওটায় আমায় মানায় না। আর ফেসবুকে প্রচারটা আমার ঠিক ভাল লাগে না। ওটা থাক।

-একটা ফ্যান পেজও তো আছে তোমার। প্রায় এক দেড় হাজার মেম্বার। দিনে দিনে সংখ্যাটা বাড়ছে।

-আমি ওই মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে দেখে আসি কে কি বলছে। মন টন খারাপ থাকলে ওটা দেখে ভাল হয়ে যায়।

-আচ্ছা, তাহলে আজ আমি আসি?

-কোথায় যাবে?

-বাড়ি যাই।

-কেন? মা পুলিপিঠে বানাবে? সাহায্য করতে হবে?

-ঈশ, তোমায় সরি আপনাকে কত কিছু বলেছি। খুব খারাপ লাগছে।

-বাঃ, লজ্জা পেলে তোমাকে তো চমৎকার লাগে।

-দূর।আমি যাই...

-আরে, আরে, পালাচ্ছ কোথায়? শুনেই যাও না,এই মেয়ে, এই পাগলী..

আকাশ বাতাস ও তৃষ্ণা

তৃষ্ণার দিকে তাকালে সায়কের বুক তেষ্টায় ভরে ওঠে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তৃষ্ণার একটা রীতিমত জিম করা ঘ্যামা দাদা আছে। সায়কের সেই দাদাকে দেখলে তেষ্টা মিটে বিতৃষ্ণা দেখা দেয়। তৃষ্ণার জিম করা দাদাকে সবাই করবেট বলে ডাকে। এখন নয় ছোটবেলায় সে নাকি এয়ারগান নিয়ে বিস্তর কাককে বিবস্ত্র করেছে। করবেট গানার্সদের ফ্যান, মানে ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগে আর্সেনালের ভক্ত এটুকু সায়ক জানে কিন্তু এটা জানে না করবেট আরসালানের বিরিয়ানি ভালবাসে কিনা! আসলে করবেটকে মোটেও বিরিয়ানির মত দেখতে নয়। বরং দেখলে মনে হয় একটা পাঁচ টাকা দামের ছোলা মটর সিদ্ধ ঘুরে বেরাচ্ছে। এবছর ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে তৃষ্ণা যখন মৌচাক থেকে ক্যাডবেরি কিনছিল সায়ক সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে ছিল। হৃদয় ঠাণ্ডা করা চাউনি নিয়ে করবেট তার দিকে তাকানোয় সায়কের চোখ তখন বন্ধ হতে পারলেই বাঁচে।

এসব কারণেই সায়কের আজকাল মনমেজাজ ভালো নেই। এই তো সকালেই ইলেকট্রিক বিল জমা দিতে গিয়ে টেলিফোন এক্সচেঞ্জে চলে গিয়েছিল। বিল জমা দিতেই বুড়ো মত বিল কালেক্টর তার দিকে কড়া চোখে তাকাল। কেমন হুঁকোমুখো হ্যাংলার মত দেখতে লোকটাকে। তার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বলল "কবিতা লেখেন নাকি?" সায়ক বিনামেঘে কাশল। বলল "লিখি মাঝে মধ্যে"। উত্তর শুনে খিটখিটিয়ে উঠল লোকটা "আগেই বুয়েচি, কবিতা না লিখলে এমন ভুলো মন হয় নাকি! আপনি টেলিফোন এক্সচেঞ্জে এসছেন। যান যান ভিড় করবেন না"। বলে গজগজ করতে থাকল "কত যে উড়ো কবি বেড়িয়েছে বর্ষাকালে শীতকালের কবিতা লেখে আর মন ভুলো করে ঘুরে বেড়ায়। কাল কালে যে কি দিন দেখতে হল..."

সায়ক মানে মানে সরে পড়ল সেখান থেকে। তার আজকাল কিছুই ভাল লাগে না। তৃষ্ণার জন্য কবিতা লিখে লিখে তার ডায়েরির মেমোরি ফুল হয়ে গেছে। তার দিনরাতের কর্মকাণ্ডের মধ্যে এখন নতুন যুক্ত হয়েছে প্রতিদিন বিকেলে সাইকেল নিয়ে তৃষ্ণার বাড়ির সামনে দিয়ে চক্কর কাটা। বাড়ির সামনে মাঝে মধ্যেই তৃষ্ণা ব্যাডমিন্টন খেলে। সাইকেলটা তখন স্লো হয়ে যায়। সায়ক সমস্ত উত্থান পতন দেখতে পায় তৃষ্ণার। তবে করবেটের চেহারার মতোই ওর গাম্বাট বাইকটা থাকলে সায়ক মোটেও সাইকেল স্লো করে না, হুহু করে বেরিয়ে যায়। কে জানে মাপলে হয়ত সে গতিবেগ আলোর চাইতেও বেশি পাওয়া যেত।

এ মফস্বলে অগাধ রাস্তা। তৃষ্ণাদের বাড়ির সামনেটা পুরোটাই কংক্রিটের, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলে এখানে ব্রিটিশদের যুদ্ধ বিমান নামত। অনেকেই বাড়ির সামনে ফুলের গাছ পোতায় জায়গাটা বেশ মায়াবী মায়াবী রূপ পায়। আর সায়কও মায়াবী তৃষ্ণা, কচি গোলাপ, কামিনী ফুল ইত্যাদি দেখে বাড়ি ফিরে বড় বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

সায়ক ভাবছিল সুন্দরী মেয়েদের দাদা থাকা দরকার নাকি। কত ভাল হত যদি একটা ভাল দিদি থাকত। একেবারে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের মত, হয়ত দেখা গেল সায়ক বাড়ির সামনে থেকে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ উফ করে পড়ে গেল। দিদি এল। বলল "আসুন আসুন ভাই" বলে হাত ধরে নিয়ে যেত ঘরে। ডেটল সাবান দিয়ে যে জায়াগাগুলো ছড়েছে সেখানে তুলো দিয়ে দিত। দরজার পাশে এককোণে দাঁড়িয়ে থাকত তৃষ্ণা। মুখে একটা টোটাল সলজ্জ হাসি।

সে আর হল কই! কোথাকার একটা হুদো দাদা জুটেছে দিনরাত খালি জিমে পড়ে আছে, বারবেল ডাম্বেলগুলোর জন্যও আজকাল সায়কের কষ্ট হয়। ওরকম গাবদা হাত যাদের ধরে, তাদের শরীরে আর কিই থাকবে ক্ষয় ছাড়া!

পাড়ার রতনদা ম্যানেজমেন্ট পাশ। তার কাছে সায়ক সমস্যা নিয়ে গেলে রতনদা একটা সিগারেট মোটামুটি গাজার দমে টান দিয়ে বলল (সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণঃ সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক :D) "দেখো বাপু। আগে তোমায় ভাগ করে নিতে হবে। কি ভাগ করে নিতে হবে?" বলে মাথাটা গৌতম দেবের মত দোলাল রতনদা। "ভাগ করে নিতে হবে সময়। তোমায় দেখতে হবে ঐ মাংসের দোকান কখন থাকে। তারপর দেখতে হবে তৃষ্ণার কোন ইয়ে মানে বয় ফ্রেন্ড আছে কিনা"। সায়ক প্রতিবাদ করল "না তা নেই, কার এত দম আছে করবেটকে টপকে তৃষ্ণার দিকে হাত বাড়ায়"। রতনদা চোখ মারল "ও, তবে তো লাইন ক্লিয়ার, মেয়েটা কিসে পড়ে?" সায়ক বলল "এই তো আমাদের কলেজেই পড়ে। একই ক্লাস তবে কলেজে আসে না। এক আধটা ক্লাসের জন্যে এলে ঐ করবেট ব্যাটা নিয়ে আসে। যতক্ষণ ক্লাস করে ততক্ষণ কমনরুমে ক্যারাম খেলে ওর বন্ধুদের সাথে,তারপর ফিরে যায়। তাহলে বল আমি কখন কি করব! ঐ জন্যেই তো ওর বাড়ির সামনে মাঝে মধ্যে ফিল্ডিং দিতে যেতে হয়।"
রতনদা এবার চিন্তায় পড়ল। চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থেকে বলল "ইয়ে আমার অফিসে একটা প্রেজেন্টেশন আছে কাল, তুই এখন যা পরে আসিস"।
সায়ক বুঝল রতনদা ফেল মেরেছে। চুপচাপ কেটে পড়ল।
সে কানাঘুষো শুনেছে ব্রতী পাড়ার ইমন, আট নম্বরের রাজীব আরও চার পাঁচটা ছেলে তৃষ্ণাকে টারগেট করেছে তার মত। কেউ কেউ করবেটের সাথে ভাব জমানোর উদ্দেশ্যে জিমেও ভর্তি হয়েছে। টেনশান বাড়ছে। মাঝে মাঝে মাছের কাটা গলায় ঢুকে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে "অবস্থা মোটেই সুখকর নয় কমরেড"।
২।।

সোনার দোকান
আকাশছোঁয়া
গাছের ভিড়ে
একলা শালুক
পলকা প্রেমিক
একলা হাসে
তোমার ছোঁয়া
স্পর্শকাতর
তারার ভিড়ে

"এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয় কি বল?" আজকাল স্বপ্নেও হানা দিচ্ছে করবেট। তৃষ্ণাকে নিয়ে তার ঘুমগুলো যখন কাব্যময় হয়ে ওঠে চারিদিকে তখন কোত্থেকে হিন্দি সিনেমার ভিলেনদের মত কালো মুখোশ পড়ে হানা দেয় ব্যাটা।

তারপর... সায়ক কার নাম?

এম কেডির ক্লাস কোন কালেই সায়কের ভাল লাগে না। যত বিতিকিচ্ছিরি নোট লেখায় আর ব্যাটার আরও দোষ আছে। ফার্স্ট বেঞ্চে বসে মেয়েগুলোকে নোট দিতে দিতে চশমার ওপর দিয়ে দেখে ব্যাটা।
আর তৃষ্ণা ক্লাস করলে তো কথাই নেই। ব্যাটা খালি ওকেই তুলে তুলে প্রশ্ন করার চেষ্টা করে। "আচ্ছা বলতো রাধার পূর্বরাগ কেন হয়েছিল"। সায়কের মনে হয় এমকেডির পূর্বরাগ ছুটিয়ে দেয়। কিন্তু কিছুই করার নেই। সে চুপচাপ দেখে। সে ভাল করেই জানে তার অবস্থা জরুরি অবস্থায় বিরোধী দলের নেতার মত। সবই দেখে যাও। কিছু করার নেই। তার আজকাল পড়াশুনাতেও মন বসে না। ভাল ছাত্র হয়েও সে বাংলা পড়তে এসেছে কেন সবার প্রশ্নের উত্তর যেমন দিতে পারেনা, একইভাবে তৃষ্ণাকে কেন ভাল লেগে গেল সে জানে না। তাদের ক্লাসেই পার্বণী বলে একটা মেয়ে আছে যার বুক দেখে তার বন্ধু পুলক বলেছিল

“অত বড় বুক মেয়েটা সামলায় কি করে কে জানে, ‘র’ পেলে নিয়ে নিত। এক একটা যেন মিসাইল। যখন তখন সুইচ দিলেই পাকিস্তানের দিকে উড়ে যাবে!” পুলক তাদের কলেজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক। সব সময় চশমা গুঁজে ইন্টেলেকচুয়ালের মত মুখ করে ঘুরে বেড়ায়। যেন এই মাত্র অল বেঙ্গল কবি সম্মেলনে ওকে কবিতা পড়তে ডাকা হবে। ব্যাটা ভাল করেই জানে তৃষ্ণার উপর সায়কের ভাল রকম চাপ আছে সেজন্য তৃষ্ণা যখনই ক্লাসে ঢোকে পুলক চেচিয়ে ওঠে “সায়ক কই গেলি রে”? সবাই চমকে ওদের দিকে তাকিয়ে দেখে দুজন পাশাপাশি বসে আছে। সায়ক তখন কোথায় লুকোবে বুঝে পায় না। একটাই জায়গা যেখানে করবেটবিহীন তৃষ্ণার উপর তার ইম্প্রেশন জমানোর সুযোগ আছে সেখানেও পুলক ব্যাটা লেঙ্গি মারে। এমকেডি যখন পূর্বরাগ পড়ায় সায়ক তখন তৃষ্ণাকে দেখে আর জীবনানন্দের কবিতা আউরায়। নোটসের খাতা কবিতায় ভরাট হয়ে যায়।

ক্লাসের বাইরে বসন্তের পাতারা ভেসে বেরোয় “মোহাব্বতে” স্টাইলে। নাম না জানা ফুলের গন্ধ ভেসে আসে ক্লাসের ভেতরে। কলেজের মাঠটায় জোড়ের সংখ্যা বাড়ছে। রাতে ঘুম না হলে জেগে বসে বসে চাঁদ দেখে সায়ক।

এমনি এক দিনে কলেজ ম্যাগাজিন নিয়ে ক্লাসে ঢুকল তৃষ্ণা। ঢুকে সায়কের হার্টবিট দ্বিগুণ করে দিয়ে বলল “সায়ক কার নাম?” সায়ক বুঝতে পারল না কি কেলো হয়েছে। সে বাচ্চা ছেলের মত হাত তুলল। তৃষ্ণা তার সামনে এসে ম্যাগাজিনটা বের করল। “ এসব কি ট্র্যাশ লিখেছ হ্যাঁ? তৃষ্ণা তোমার সকালবেলায় ভাসুক ফুলে বসন্তেরা? এসব কি?” হতভম্ব হয়ে গেল সায়ক। এসব কলেজ ম্যাগাজিনে বের করেছে পুলক! নিশ্চয়ই তার নোটসের খাতা থেকে নিয়েছে! তৃষ্ণার সামনেই সে নোটস খাতাটা বের করল। বেশ কয়েকটা পাতা ছেড়া। তৃষ্ণা রাগে ফুসছিল, “তুমি ভেব না তুমি এসব করে পার পেয়ে যাবে, পড়তে আস না এই সব করতে আস? মজা পাও না? মজা দেখাব তবে!” ক্লাসের সবাই হাসছিল। সায়ক দেখল পুলকের মুখটা নিচু। সে কিছু বলল না। ছেলেটা তাকে ভালবেসেই এই দুষ্টুমিটা করেছে সেটা বুঝতে পারছিল।

“কিবে রোমিও খুব প্রেম উথলেছে না? আয় আয়”, করবেট, সীমান্ত, রণরা কলেজের পাশের মাঠে রক্তাক্ত সায়ককে যখন ফেলে রেখে গেল তখন সন্ধ্যে নেমে এসেছে। কলেজ শেষে এই এলাকায় কেউ থাকে না। শুধু পুলক লুকিয়ে বসে ছিল এককোণে। নিরস্ত্র সায়ককে ওরা যখন মারছিল পুলকের কিছুই করার ছিল না। করবেটদের পরিবারের লোক এখানে যা বলে তাই আইন। সে শুধু ওরা চলে গেলে সায়ককে তুলে নিয়ে গেল।

৩।।

শেষমেশ সবাই চলে গেল
ডাহুক, কোকিল, এমনকি তোমাদের বাড়ির পোষা বিড়ালটাও
একঘেয়ে রেডিওটা
আমার পুরনো হারমোনিয়ামের কোমল ‘পা’,
আমার দাদুও
মারা গেল এবারের শীতে।
শুধু তুমি র্য়ে গেলে তৃষ্ণা।

কলকাতা যেতে আজকাল ভালই লাগে সায়কের। সাইকেল করে স্টেশান, ওখান থেকে বনগাঁ লোকাল করে শিয়ালদা। বনগাঁ লোকালের ভিড় মন খারাপ ভোলানোর মোক্ষম জায়গা। দম ফেলবার অবসর দেয় না। দত্তপুকুর পেরনোর পর ডেলি প্যাসেঞ্জারদের মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিঙয়ে একটু বসতেও পারে। বাবার বন্ধুরাই বেশি থাকে। সেদিনের ঘটনার পরে মা বাবা ভয় পেয়েছিল। বেশ ঘাবড়ে গেছিল। বাবাই তারপর

বকাবকি করে জয়েন্টে বসায়। শুরু থেকেই সায়েন্সের ছেলে জয়েন্ট দেবে না কেন এই ধুয়ো তুলেছিল বাবা। বাংলা নিয়ে রোম্যান্টিসিজমও আর মেনে নিতে চায়নি। সায়ক এবার আর প্রতিবাদ করল না। কলকাতাই কিছুটা ভুলাতে পারে তাকে।

বাবা একটা নতুন মোবাইল কিনে দিয়েছে। উদ্বিগ্ন মা তাতে মাঝে মাঝেই ফোন করে। ট্রেনে উঠে একটা, ট্রেন থেকে নেমে, একটা কলেজে পৌঁছে একটা মিসড কল দিলে তবে মা নিশ্চিন্ত হয়। পুলক আসে মাঝে মাঝে বাড়িতে। যেদিন হাসপাতাল থেকে ছেড়ে ছিল সায়ককে পুলক ওর হাত ধরে কেঁদে ফেলেছিল। বার বার ক্ষমা চায় এখনও।

সায়ক সবই ভুলে গেছে। শুধু মাঝে মাঝে কোন কোনদিন কলেজ না গিয়ে কলকাতা ঘুরতে বেরিয়ে পড়ে। উত্তর কলকাতার গলির গন্ধ, কলেজ স্ট্রিটের বইয়ের গন্ধ নাকে করে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে শুধু মাকে আশ্বস্ত করে মার ছেলে বেঁচে আছে।

সেদিন জোড়াসাঁকো দেখতে বেরিয়েছিল সায়ক। হঠাৎ এমন বৃষ্টি এল যে একদৌড়ে একটা পানের দোকানের তলায় ঢুকে পড়তে হল। বৃষ্টিতে ভেজা গায়ে মোবাইলটা বেজে উঠল। সায়ক বিরক্ত হল। মা এত ইন্সিকিউরিটিতে ভোগে! দুবার রিং হবার পর বিরক্ত হয়ে ভেজা হাতে ফোনটা বের করতেই দেখল অজানা নম্বর। সে ফোন কানে নিতে শুনতে পেল,

“ ‘তৃষ্ণা তোমার সকালবেলায় ভাসুক ফুলে বসন্তেরা
তৃষ্ণা তোমার রাত্রিবেলায় আগুন জ্বালুক বিপ্লবীরা
তৃষ্ণা তোমার পায়ের তলায় শিশির ছড়াক ভোরের বাতাস
তৃষ্ণা আমার এ প্রাণ জুড়ে তুমিই শুধু তুমিই আকাশ’
আমায় ক্ষমা করে দেবে সায়ক?”

সায়ক স্তব্ধ হয়ে রইল। গলাটা চিনতে ভুল হবার কথা না তার।

হুমায়ূনের সাথে দেখা

কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি যাচ্ছি। ওখান থেকে যাব সিকিম। ট্রেনের সব টিকিট কনফার্ম হয়নি। মন মেজাজ খারাপ। সাথে আমার এক বছরের ছেলে। চারজন যাব তার মধ্যে দুটো টিকিট কনফার্ম। বউএর সাথে ঝগড়া হব হব করছে। অনেকবার বলেছিল স্লিপার ক্লাসে যেতে আমি পাকামো মেরে এসিতে কাটতে গিয়ে এই কেস করেছি। প্ল্যাটফর্মেই স্টেশন বন্ধু একজন ঠিক করেছি ট্রেনে তুলে দেবে। একই দাপটে বাবা মা-ও বকে যাচ্ছে। ঠিক করেছি একটা বার্থে আমি আর বউ শেয়ার করব, আরেকটায় বাবা মা। ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই হুড় মুড়িয়ে উঠে পড়লাম। বিরাট ভিড় স্টেশানে। কোন মতে উঠেই আমরা ভিখারির মত এদিক ওদিক দেখছি। সব ভারী ভারী লটবহর নিয়ে ঢুকছে। এসি টু টিয়ার। ছেলে কোলে নিয়ে বসতেই সামনে যিনি বসেছেন তাকে দেখে একটা ধাক্কা মত খেলাম। এও কি সম্ভব? বইমেলার সময় বাংলাদেশের স্টলে লম্বা লাইন দিয়ে প্রতি বছর এনার বই কিনি। ইন্টারনেটে যেখানে ফ্রি তে ইবুক পাওয়া যায় সেখান থেকে ডাউনলোড করি পাগলের মত। হুমায়ূন আহমেদ।

এ অসম্ভব! আমি ট্রেনের ওই টেনশানের মধ্যেই
ছেলে কোলে নিয়ে হা করে দেখছি ভদ্রলোককে। উনি তো মারা গেছেন দেখলাম দু মাস আগে। তবে ইনি কি ওনারই মত দেখতে? বাবা মা পেছনের দিকের সিটে বসেছেন। আমার বউ ওইখানেও গজগজানি শুরু করেছে, কতবার বললাম স্লিপারে কাটো স্লিপারে কাটো এবার বোঝ ঠেলা। আমার বউয়ের কথা শুনেই হয়ত সামনের হুমায়ূন আহমেদ বলেউঠলেন,
“আপনারা কজন? আমার সাথে দু জন আসেননি, অসুবিধে হবে না।“
শুনে যেন হাতে চাঁদ পেলাম । এক লাফ দিয়ে বাবা মাকে নিয়ে চলে এলাম। টিটি ঝামেলা সব কাটিয়ে ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে দেখি হুমায়ূন আহমেদ নেই! বাথরুমে যেতে গিয়ে দেখি ট্রেনের একদিকের একটা দরজা খোলা। আর ভদ্রলোক সিগারেটে টান দিয়ে চলেছেন। বয়স আনুমানিক ৬৫-৬৬ হবে। চুল মেহেন্দি করার মত লাল কালোর শেড। একেবারে হুমায়ূন আহমেদ। আমি বললাম, “আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব!”
সিগারেট খেতে খেতেই ভদ্রলোক মেজাজে হাত নাড়লেন। “নানা, ধন্যবাদের কি আছে, এতো না করার কিছুই নেই!” আমি আর সামলাতে পারলাম না শেষমেশ বলেই ফেললাম, “ কিছু মনে করবেন না, আপনাকে না একদম হুমায়ুন আহমেদের মত দেখতে”।
ভদ্রলোক সিগারেট টান মারতে মারতেই বললেন “দেখতে কি বলছেন আমি তো হুমায়ুন আহমেদই”।
আমি ভিরমি খেলাম। বললাম,” সেকি, হুমায়ূন আহমেদ তো দুদিন আগে মারা গেছেন”,
ভদ্রলোক বললেন, “দূর দূর, মৃত জীবিত তুমি কি বুঝবে হে ছোকরা?দুদিনের ছেলে, তুমি কি করে জানবে।“
কথা বলতে বলতে বৃষ্টি চলে এল। তুমুল বৃষ্টি। জলের ঝাপটা লাগতে লাগল। আমি দরজা বন্ধ করতে গেলাম। হুমায়ূন স্যার বাঁধা দিলেন, “তোমার বৃষ্টিতে সমস্যা হলে ভিতরে যাও। আমি ভিজব”। আমি অপ্রস্তুত হলাম। তারপরই উৎসাহের সাথে বললাম, “ও আপনার তো বৃষ্টি দারুণ প্রিয়। শুনেছি আপনার নুহাশ পল্লীতে আপনি একটা ঘর বানিয়েছিলেন বৃষ্টি বিলাস বলে!”

শুনে ভিজতে ভিজতে সিগারেটে টান দিয়ে বললেন "দূরসেতো অনেক পরে। ছোটবেলায় কাদামাঠে ফুটবল খেলে কতবার যে বাড়িতে মার খেয়েছি! বাবার চাকরি সূত্রে যেখানেই গিয়েছি সেখানেই বৃষ্টিতে ভিজেছি। আমার বাবাও আমার মত বৃষ্টি পাগল ছিলেন"।

আমি বললাম "আপনি তো জ্যোৎস্নারও তো খুব ভক্ত। চান্নি পসর রাইত শুনেছি জেগেই কাটিয়ে দেন!"

অবহেলার সাথে হাসলেন। আমার বুকটা দুরুদুরু করলেও জীবিত কিংবা মৃত হুমায়ূন আহমেদকে দেখার আনন্দে লাফাচ্ছিল। আমরা কলকাতায় থাকি। কত ভুলভাল খবর আসে। এরকমও তো হতে পারে হয়ত হুমায়ূন আহমেদের জায়গায় অন্য কোন হুমায়ূন মারা গিয়েছেন। জানিই না সেটা। এখন মনে হচ্ছে ওই খবরটা ঠিক না।

আমার বউ আমার দেরী দেখে একবার দেখে গেল। মুখ খুশি খুশি ভাব। ওকে আর বললাম না বিয়ের পর পর তুমি যে জন্যে আমার উপর রাগ করেছিলে সেই কারণ আমার সামনে দাঁড়িয়ে। মানে কিছুই হয় নি। আমার খেতে খেতে বই পড়ার অভ্যাস আছে। পড়ছিলাম হিমু ও পাঁচটি নীলপদ্ম। হিমু আর মরিয়মের গল্পে যখন আমি বুঁদ আমার বউ জিজ্ঞেস করেছিল মাংস কেমন হয়েছে। আমি শুনিনি। সে নিয়ে দু দিন কথা বলেনি।

হুমায়ূন সাহেব বউ চলে যাবার পর আমায় দেখে চোখ নাচালেন, "বউ"? আমি বললাম "হ্যাঁ"। তারপর একটু খোঁচা দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না, "আপনার তো শুনেছি দুই খানা"। রাগলেন না। আমায় তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে বললেন, "তোমাদের শীর্ষেন্দু কি লিখেছে হে কাগজের বউ এ? কোন জিনিয়াস এক মেয়েতে সন্তুষ্ট হয় না। আমি কে জান? আমি পলিমার সায়েন্সের ডক্টরেট। দিস্তে দিস্তে লিখিইনি খালি। প্রথম যখন সিরিয়াল করা শুরু করি দেশে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলাম। আমার এক একটা বইয়ের কত কাটতি জান? তোমাদের দেশে তো আনন্দবাজার, দেশ বললে তোমরা হাগ মোত। আমাদের দেশে আমিই দেশ"। আমি বাঁধা দিলাম,"তা বলে মেয়ের বান্ধবী?"

আবার রাগলেন "যেটা বুঝ না, সেটা নিয়ে তর্ক কোর না। পৃথিবীর কোন পুরুষ নিজের বিয়ের পর সেই বউ নিয়ে সারাজীবন ঘর করতে চায়?ভালবাসা বয়স দেখে হয় না। মন দেখে হয়। পুরুষ নারীর মধ্যে কি দেখে? নারীর চোখে নিজের মুগ্ধতা দেখতে চায়। আমার মনে হয়েছিল আমি করেছি। বেশ করেছি। তোমাদের কি হে বাপু? আমার ব্যক্তিগত জীবন ব্যক্তিগতই থাক না!"

আমি মজা পেলাম। হুমায়ূন স্যারের মত লোক এত সোজা সরল জানা ছিল না।এ দেখি মুখের কোন আগল নেই। আমি আরও খোঁচানর চেষ্টা করলাম, "আচ্ছা আপনি কোনটা? হিমু? মিসির আলী? না সেই লেখক ভদ্রলোক যিনি ডিভোর্সের পর শালীর চোখে নিজের মুগ্ধতা দেখার জন্য আজিব কাজ করতেন?"

স্যার সিগারেটে আরেকটা লম্বা টান দিলেন। বুঝলাম অনেক কিছু বলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কিন্তু আমাকে হতাশ করে বললেন, "আমি? আই অ্যাম নো বডি"। আমি এবার বেপরোয়া, বললাম "আপনি যাই বলেন, আমার কিন্তু কল্পবিজ্ঞানের গল্পের ক্ষেত্রে আপনার থেকে আপনার ভাই জাফর ইকবালের লেখা বেশি ভাল লাগে"। হুমায়ূন আহমেদ হাসলেন, "তুমি কি এটা আমাকে রাগাবার জন্যে বললে? বলে লাভ নেই, আমার ভাই আমার থেকে ভাল লিখলে তোমাদের থেকে অনেক বেশি খুশি হই আমি"। আমি বললাম, "কিন্তু দ্বিতীয় বিয়ের পর আপনাকে তো প্রায় এক ঘরে করে দেওয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে তো ইকবাল সাহেবও ছিলেন"।

হুমায়ূন সাহেবের চোখটা একটু জ্বলে উঠল যেন, বললেন "তোমাকে আমি আগেও বলেছি ডোন্ট ইন্টারফেয়ার ইনটু মাই পার্সোনাল অ্যাফেয়ার"।

আমি চাপ খেয়ে গেলাম। ক্ষমা চেয়ে নিলাম। বৃষ্টিটা ততক্ষণে ধরেছে, আর কি আশ্চর্য আজ পূর্ণিমা নাকি জানতাম না তো! আকাশজোড়া চাঁদের আলো। হুমায়ূন আহমেদ মুগ্ধ হয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছেন। এরমাঝে বর্ধমানে ট্রেন ঢুকল। দু একজন রাতের ট্রেনে তাড়াহুড়ো করে উঠল। টিটি এলেন। দরজা বন্ধ

করতে বললেন। হুমায়ূন স্যার বারণ করলেন। টিকেট চেকার ভদ্রলোকটিও কেন জানিনা কাঁধ ঝাকিয়ে চলে গেলেন।

আমি নীরবতা ভঙ্গ করলাম। "কিছু মনে করবেন না, পরের দিকে আপনার হিমু পড়ে বিরক্তি লাগত। ওই একই লেখা। একই অলৌকিক কিছু করার চেষ্টা। সেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিগ ব্যাং থিয়োরি আনার চেষ্টা!"

হুমায়ূন স্যার আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, নরম গলায় বললেন, "একটা কুমারী মেয়েকে যখন বিয়ে করো তখন প্রথম কিছুদিন ভাল লাগে। তারপরে মনে হয় না ওহ সেই একই চিবুক, ওই একই চোখ, একই রকম হাসি? ভ্যারাইটি পাও? কয়টা লেখক আছে প্রথম প্রেমের মত লিখে যেতে পারে দীর্ঘকাল? নীললোহিত তো আমিও পড়ি। এখনের লেখা আর আগের লেখা এক লাগে? সেই তো দিকশুন্যপুর, বন্দনাদি আর সংসার পালানো মনোভাব। আমাদের হিমুর পশ্চিমবঙ্গীয় ভারসান যেন। আর শীর্ষেন্দু সমরেশও এখন পাতে দেবার মত নয়। নামে চলে"।

আমি হাসলাম। খুব একটা ভুল কথা নয়। বললাম "তবে আপনি কিন্তু কবিতায় ফ্লপ যাই বলেন"।

হুমায়ূন স্যার বললেন, "তা যদি তুমি বই বিক্রির হিসেবে বল তাহলে সুপার হিট। আর যদি হুমায়ূন আহমেদের অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞেস কর তাহলে হ্যাঁ। আমি মেনে নিই যে আমি ফ্লপ"।

আমি আবার ব্যক্তিগত প্রশ্ন করার লোভ সামলাতে পারলাম না, "আচ্ছা দ্বিতীয় বিয়ের পর আপনার ছেলেমেয়ের জন্যে মন খারাপ লাগত না?আপনার তো এরকম একটা উপন্যাসও আছে যেখানে বাবা দ্বিতীয় বিয়ের পর লুকিয়ে লুকিয়ে ছেলে মেয়েদের দেখতে আসত। একই ঘটনা কি আপনার ক্ষেত্রে ঘটেনি?"

এই সময় আর ফুসে উঠলেন না সাহিত্য সম্রাট। বললেন "তা কি আর হয় না। কিন্তু একটা নতুন দরজায় ঢুকলাম যখন পুরনো কিছু দরজা তো বন্ধ করতেই হল। আমার ছেলে নুহাশ চিংড়ি বড় ভালবাসে। ওর সাথে একবার দেখা করতে যাই বড় বড় চিংড়ি নিয়ে। ওকে দিয়ে আসি। তারপর কদিন মন খুব খারাপ ছিল। লিখতে যেতাম, লিখতে পারতাম না, রাইটার্স ব্লক মত হয়ে গিয়েছিল। সে সময়টা শাওন খুব সাহায্য করেছিল। কিন্তু শাওনকেও সব কথা বলতে পারিনি। কিছু কিছু কথা বলা যায় না"।

আমি বুঝতে পারলাম স্যারের মুড অফ হচ্ছে, কথা ঘোরালাম, "আচ্ছা আপনার বেশিরভাগ লেখাতেই কোরানের খুব উদ্ধৃতি থাকে। তবে সেই লেখাগুলি বেশিরভাগই সাম্প্রতিক কালের।আপনার লেখা থেকেই আমরা হিন্দু পাঠকরাও মাগরেবের নামাজ, ফজরের আজান, ইয়া মুকাদ্দেমু ইত্যাদির সাথে মিশে গিয়েছি যেন। আমিও আজকাল বেশি বিপদে পড়লে ইয়া মুকাদ্দেমু বলে ফেলি। আপনিও কি বেশিরভাগ বাঙালীর মত বুড়ো বয়সে ধর্মে মন দিলেন? আর আপনার বেশিরভাগ উপন্যাসের নাম রবীন্দ্রনাথের গান থেকে "তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে" এই টাইপের অথবা কখনও কখনও অতি নাটকীয় "আকাশজোড়া মেঘ", "চলে যায় বসন্তের দিন", "আজ আমি কোথাও যাব না", "পেন্সিলে আঁকা পরী", "আমার আছে জল", "বাসর" বলে শেষ করা যাবে না। এই রকম কেন?"

হুমায়ূন আহমেদ করুণ হাসলেন। বললেন "তোমার বয়সী ছেলেরা একটু নাস্তিক হয়, একটু রবীন্দ্রবিদ্বেষীও হয়। আমিও ছিলাম। তারপর বয়স যত বাড়তে থাকল অবধারিত ভাবে ধর্ম নিয়ে লেখা পড়া শুরু করলাম। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ছোট থেকেই আমার পাশে পাশে চলছেন। তারপর সবকিছু যেন একটা জায়গায়, একটা বিন্দুতে এসে মিলে গেল"।

রাতের ট্রেন ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে স্টেশনগুলি আলোর বেগে হু হু করে বেড়িয়ে যাচ্ছে, আমার বউ, বাবা, মা সবাই এক বার করে ডেকে ডেকে গেছে। কাটিয়ে দিয়েছি। এরকম সুযোগ আর কতজন পায়?

আমার মনে পড়ে আমার পড়া প্রথম হুমায়ূন আহমেদ বেশি দিন আগে না। বছর ছয়েক আগে হবে। পড়া পড়ি নিয়ে আমি বেশ উন্নাসিকও ছিলাম। হঠাৎ পূজাবার্ষিকী দেশে হুমায়ূন আহমেদের "নীল মানুষ" উপন্যাসটি পড়ি। পাগল হয়ে গিয়েছিলাম লেখাটি পড়ে। তারপর পাগলের মত যেখানে হুমায়ূন আহমেদ পেতাম সেখানে পড়তাম। একটা সময় ছিল যখন সারারাত ধরে হিমু,মিসির আলী, শুভ্র গোগ্রাসে গিলতাম।

চোখের সামনে ঢাকা শহর দেখতে পেতাম যে রাস্তা দিয়ে হিমু হেঁটে যেত। কলাবাগান, গুলশন কোনদিন বাংলাদেশ না গিয়েও সড়গড় হয়ে গেছে যেন। কতবার তার অসমাপ্ত উপন্যাস পড়ে মনে মনে গালাগাল দিয়েছি। এখন আমার রক্তের সাথে মিশে গিয়েছে যেন হুমায়ূন আহমেদ। আজ সেই মানুষটাকে সামনে পেলে একরাত ট্রেনে না ঘুমালে হবে না?

কৌতূহলী প্রশ্নটা অনেকক্ষণ মনের মধ্যে ছিল। শেষে করেই ফেললাম, "আচ্ছা আপনি দার্জিলিং মেইলে কোথায় যাচ্ছেন?"

হুমায়ূন আহমেদ প্রশ্নের জবাব দিলেন না। আমার দিকে অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকালেন, "বলত আমার ওই উপন্যাসটার নাম কি যেখানে প্রেমিকা বা প্রেমিক মারা যাবার পর বার বার চেষ্টা করা হয় তাকে বাঁচিয়ে আনার? আমার নামটা মনে পড়ছে না। "নি" কি?"

আমারও মনে পড়ছিল না। মাথা নাড়লাম। তিনি বললেন "ধরে নাও আমি কোথাও যাচ্ছি না, কোথাও যেতাম না, ধরে নাও আমি মেঘের ওপর বাড়ির সেই আত্মা যে মৃত্যুর পর মাঝে মাঝে সব কিছু দেখতে পেত,শুনতে পেত"।

আমার শিউরে ওঠা উচিত ছিল, কারণ আমার স্পষ্ট মনে পড়ে গেছে হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যুর পর কী একটা যেন খুব বিশৃঙ্খলা হয়েছিল, তার মৃতদেহ নিয়ে টানা হেচড়া হয়েছিল। কিন্তু আমার কেন জানিনা ভয় পাচ্ছিলাম না। বললাম, "আপনি কি তবে চলে যাবেন?"

আমার সামনের হুমায়ূন আহমেদ ধীরে ধীরে, অতি নাটকীয়তা ছাড়াই আবছা হওয়া শুরু করল, আমি অস্থির হয়ে উঠলাম, "যাবার আগে বলে যান, আর দুটো সিট যারা আসেননি সেটা কাদের টিকিট ছিল?"

উনি বলতে চেষ্টা করলেন, কিছুই শুনতে পেলাম না। ট্রেনের দমকা বাতাস এসে লাগছিল আমার নাকে মুখে। কিছুই দেখা গেল না আর। বাইরে হুমায়ূন আহমেদের প্রিয় জ্যোৎস্না। আকাশ বাতাস গাছ পালা সব জ্যোৎস্নালোকে ভেসে যাচ্ছিল। একেই বোধহয় উনি "চান্নি পসর রাইত" বলে উল্লেখ করেছিলেন।

মাস্টারমশাই

নিত্যরঞ্জনবাবু একজন গানের জগতের লোক। চণ্ডীগড় বোর্ডের একজন পরীক্ষক। বছরের বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষা নিতে যান। এছাড়া বাড়িতে গানের স্কুল আছে। এখনকার পাশ্চাত্য সঙ্গীত ও বলিউডি গানকে প্রাণভরে ঘৃণা করেন। কোন কোন ছাত্র-ছাত্রীর মা বা বাবা যখন তার কাছে এসে বলে "মাস্টারমশাই বাংলা সিনেমার গান শেখাবেন তো?" তখন বড় কষ্ট পান তিনি। মনে মনে বিড় বিড় করেন "এরা যে কি করবে,আরে ক্ল্যাসিকাল হচ্ছে গানের মূল, তোরা সেটা শিখে নে আগে, তারপর না হয় যা পারবি করবি"।
পুরনো হারমোনিয়াম, তানপুরা ধরে গান না শিখে যারা শুরুতেই গীটার আর কি বোর্ড নিয়ে শিখতে চায় তাদের তিনি করুণার চোখে দেখেন। গানের পরীক্ষার দিন তিনি পাঞ্জাবী পায়জামা পরে পরীক্ষা নিতে বসেন। প্রথম প্রথম ভাল লাগে। তারপর এক গান শুনতে শুনতে বিরক্তি ধরে যায়। শেষের দিকে মনের সুখে নম্বর কাটতে শুরু করেন। তার এই ব্যাপারটা ওয়াকিবহাল মহল জেনে যাওয়াতে তিনি পরীক্ষা নিতে গেলেই সবার মধ্যে মারপিট লেগে যায় কে আগে পরীক্ষা দেবে।
ব্যাপারটা হয় যে কোন একজন মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকে। এলাকার সব গানের শিক্ষকেরা ছাত্র ছাত্রী নিয়ে সেই শিক্ষকের বাড়িতে এসে হাজির হন। নিত্যরঞ্জনবাবুকে দেখলেই তারা চেষ্টা করেন এক টপকে তাকে ধরে পরীক্ষার জায়গায় নিজের ছাত্র ছাত্রীদের বসাতে। কোন শিক্ষকের ছাত্র বা ছাত্রী কম নম্বর পেলে বাজারে সে শিক্ষকের সুনাম আর থাকে না, তাই তারা এ ব্যাপারে জীবন দিয়ে দেন। নিত্যরঞ্জনবাবুও এটা বুঝতে পারেন। তিনি বেশ উপভোগ করেন ব্যাপারটা।
এবছর নিত্যরঞ্জনবাবুকে পরীক্ষা নিতে যেতে হল উত্তর চব্বিশ পরগনার প্রান্তিক এক মফস্বলে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই বনগাঁ লোকালে করে পৌঁছলেন তিনি পরীক্ষার সেন্টারে।
গিয়ে অবস্থা দেখে তার মাথায় হাত। কম বেশি একশো জন পরীক্ষার্থীর বিচারের ভার পড়েছে তার উপরে। এই অঞ্চলের নামকরা একজন গানের শিক্ষক অপূর্ববাবু। তার বাড়িতেই পরীক্ষা নিতে হবে তাকে। বেশ বড় দোতলা বাড়ি, যে ঘরে নিত্যবাবুকে পরীক্ষা দিতে হবে, সেটা একটা ছোট ঘর। কিন্তু ভারী সুন্দর করে সাজানো। নিত্যবাবুর দেখে শুনে মন খারাপ হয় গেল। তার ঘরদোর বড় আগছালো। মা মরা মেয়েটার বিয়ে হয়ে যাবার পর এখন আরও খারাপ অবস্থা।
পৌঁছতেই অপূর্ববাবুর গৃহিণী এক থালা মিষ্টি নিয়ে উপস্থিত হলেন, তা দেখে তার মন আবার খানিকটা খারাপ হল। গত মাসে তার মধুমেহ ধরা পড়েছে। তিনি ভীত স্বরে বললেন "মা, এই মিষ্টি আমি খেতে পারব না, আমার ডায়াবিটিস ধরা পড়েছে।তুমি বরং ছাত্র ছাত্রীদের দাও মিষ্টি।"
অপূর্ববাবুর গৃহিণী মাথা নাড়লেন "হ্যাঁ মাস্টারমশাই ওদের জন্য তো থাকবেই, আপনার জন্য আমি বরং অন্য কিছু করে নিয়ে আসি।"
নিত্যরঞ্জনবাবুর মনে পরে গেল প্রথম যখন পরীক্ষা নেওয়া শুরু করেছিলেন যে বাড়িতেই যেতেন এরকম একটা বড় থালায় মিষ্টি সিঙ্গারা নিয়ে আসত, আর তিনি এসবের জন্যই সোৎসাহে বসে থাকতেন। খেতে বড় ভালবাসতেন তিনি। এই ডায়াবিটিসটা ধরা পরে বড় বিপদ হয়ে গেল।
অপূর্ববাবুকে ডাকলেন তিনি। বললেন "আপনি এক কাজ করুন, প্রারম্ভিক ছাত্রদের পাঠানো শুরু করুন।"
অপূর্ববাবু তাই করলেন। একটি বছর দশেকের কন্যা এল পরীক্ষা দিতে। নিত্যরঞ্জনবাবু খুশি হলেন। এসব অঞ্চলে গানের চর্চাটা এখনও রয়েছে।

মেয়েটি মায়ের সাথে এসছে। সময় কম, তাই তিনি শুরু থেকেই পরীক্ষা নেওয়া শুরু করলেন। আধো আধো গলায় ক্ল্যাসিকাল গান ভালই লাগল তার।
সকাল দশটায় শুরু হওয়া পরীক্ষা দুপুর দুটো গড়ালে দেখা গেল তার প্রায় পঞ্চাশ জনের পরীক্ষা নেওয়া সম্পূর্ণ হয়েছে। তখনও প্রায় পয়তাল্লিশ জন বাকি। এর মধ্যে প্রায় তিরিশবার "সারা জীবন দিল আলো সূর্য গ্রহ চাঁদ", খান পচিশ বার "তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে", "নিম ফুলের মৌ পিয়ে" শুনতে হয়েছে। আর যেহেতু এ অঞ্চলে দুজন গানের শিক্ষক, অপূর্ববাবু এবং হারাধন পালিত বলে এক ভদ্রলোক তাই কমবেশি সব পরীক্ষার্থী একই বন্দিশ গেয়ে চলেছে। আর থিওরিতে বেশিরভাগই ফেলের সমধর্মী। ইমন রাগের কোমল স্বর, বা ভৈরব কোন সময়ে গাওয়া হয় এসব সহজ প্রশ্নের উত্তরও অনেকে দিতে পারল না। খানিকটা মুষড়ে পড়লেন তিনি। কানের অবস্থাও তথৈবচ। প্রতিবারই পরীক্ষা নেবার দুদিন পর যে কোন গান বাজনা থেকে দুদিন বিরতি নেন। এবার মনে হচ্ছে বিরতির সময়সীমা বাড়ানো হতে পারে।
অপূর্ববাবু অতিথিবৎসল লোক। প্রচুর খাবারের আয়োজন করেছেন। নিত্যরঞ্জনবাবু খাচ্ছিলেন যখন তখন অপূর্ববাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন বুঝলেন নিত্যবাবু? ছাত্ররা কেমন?"
অপূর্ববাবুর আগ্রহী মুখ এবং চিংড়ি মাছ নিত্যবাবুকে সত্যি কথা বলা থেকে বিরত রাখল। তিনি আর বলতে পারলেন না ছাত্র ছাত্রীদের অনেক গান শেখার আছে। রবি ঠাকুর, নজরুল অনেক গান বানিয়ে গেছেন। তার থেকে শেখা যেতে পারে। একই গান যে পরীক্ষকের কি পরিমাণ বিরক্তি উদ্রেক করতে পারে তা পরীক্ষক মাত্রেই জানেন। তবে তিনি এও জানেন এই এত পরীক্ষার্থীর মধ্যে বেশিরভাগই ক্লাস এইট নাইন অবধি গান বাজনা করবে, তারপর তাদের জীবন থেকে গান বাজনা বন্ধ হয়ে যাবে। এদেশের মেয়েদের অভিভাবকেরা গান শেখান বিয়ের বাজারে একটা এক্সট্রা ক্যারিকুলাম হিসেবে গান বা নাচ রাখার জন্যে। নাচ আবার অনেক ছেলের বাড়ি পছন্দ করে না। জনসমক্ষে শরীর প্রদর্শন মনে করে অনেকে। তাই গানই সই। নাচ শরীরে কুঁড়ি ওঠার আগে অনেক মেয়ের বাবা মা বন্ধ করে দেয়। এখন চিত্রটা কিছুটা বদলাচ্ছে তবে কম বেশি এখনও এই ধারনা মানুষের আছে।
খেয়ে উঠে বাড়িতে আজকাল একটু গড়িয়ে নেন নিত্যবাবু। স্কুল থেকে রিটায়ার করার পর এই বদভ্যাসটা হয়েছে। আজ ঘুম হবে না বুঝে একটু বিরক্ত হলেন।
তিনটে নাগাদ আবার পরীক্ষা নেওয়া শুরু হল। এবার একেবারে ধর তক্তা মার পেরেক। এক্সপ্রেস ট্রেনও বলা যায়। দুটো তিনটে করে গান শুনে ছেড়ে দিচ্ছেন। কারো ক্ষেত্রে একটাও শুনছেন।
বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ চা নিয়ে এলেন অপূর্ববাবুর গৃহিণী।আর দু এক জন বাকি। অপূর্ববাবু পরীক্ষা নেবার সময় পাশেই থাকেন। হারাধন বাবুও থাকেন। কোন প্রশ্ন করলে দুজনই ছাত্রদের ক্লু দেবার চেষ্টা করেন। এসব দেখে দেখে নিত্যবাবু অভ্যস্ত। তাই বিরক্ত হন না। প্রথম প্রথম রেগে যেতেন।
চা খেতে খেতে অপূর্ববাবু বললেন "নিত্যবাবু,একটা অনুরোধ ছিল। আমাদের বিধায়কের মেয়ে আমার ছাত্রী। ওর কলকাতায় আজ একটা জরুরি কাজ পড়ে গেছে। আমাকে একটু আগে ফোন করেছিল। সন্ধ্যে ছ'টা হবে, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে ওকে আসতে বলি?"
নিত্যরঞ্জনবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। ভেবেছিলেন পাঁচটার মধ্যে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিতে পারবেন। সেটা না পারায় বাড়ি পৌছতে দেরী হবে। এটা যদি অন্য কোন সাধারন ছাত্রীর ক্ষেত্রে হত তখন কি অপূর্ববাবু এই অনুরোধ করতে পারতেন?
এসময় "না" বলাটা অভদ্রতার সামিল। নিত্যবাবু সেটা পারলেনও না। তাছাড়া বিধায়ক বলে কথা। কত রকম ক্ষমতা এদের হাতে। বিরক্ত হলেও বসে থাকলেন পরীক্ষা নেবার পরে। একটা ছোট খাটে বসে পরীক্ষা নিচ্ছিলেন। সব শেষে তার মধ্যেই একটু পা টান করে বসলেন। এতক্ষণ ধরে গান শুনে শুনে মাথাটা ঝি ঝি করছিল। পরের দিকে ছিল তৃতীয় বর্ষ থেকে পরীক্ষা। বেশির ভাগই বেসুরো। দু একজন সুরে গাইল। তাদেরই শুনলেন কিছুটা। বাকিদের একটা গড় নম্বরে পাশ করিয়ে দিলেন। যদি দেখেন সিলেবাস ভাল

তোলেনি অনেকক্ষেত্রেই ফেলও করিয়েছেন। পরীক্ষার একটা নিয়ম আছে সেটা তিনি কঠিন কঠোর ভাবে বিশ্বাস করেন। তাকে যখন পরীক্ষা নিতে পাঠানো হয়েছে তখন সেই নীতি তো তাকে মেনে চলতেই হবে।
অপূর্ববাবু গল্প করছিলেন তার সাথে। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিলেন। অপূর্ববাবু আশ্বস্ত করলেন তাকে গাড়ি করে স্টেশান পৌঁছে দেবেন। অপূর্ববাবু এখানকার এক স্কুলের হেড মাস্টার মশাই। আবার একাধারে সঙ্গীতের মাস্টারমশাইও। তিনি এরকম দেখেননি এর আগে। ঘটনাটি বিরল। আর ভি আই পির মেয়ে। খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি তো হবেই। দেখা যাবে একেবারেই গান করতে পারে না। দু একটা কোন মতে শুনেই পালানো যাবে।
ছ'টা দশ নাগাদ মেয়েটি এল। সাথে মেয়েটির মা। নিত্যবাবু উঠে বসলেন। মেয়েটি রবীন্দ্রসঙ্গীত পঞ্চম বর্ষের ছাত্রী। তিনি মেয়েটিকে বললেন নিজের পছন্দের একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাতে। মেয়েটি গাইল "এই লভিনু সঙ্গ তব"। নিত্যবাবু অবাক হয়ে গেলেন। এ কি অপূর্ব কণ্ঠস্বর। তার মনে হচ্ছিল স্বর্গে আছেন। চারিদিক এক অপূর্ব স্নিগ্ধতায় ভরে যাচ্ছিল। মেয়েটি যখন গাইছিল "আলোকে মোর চক্ষুদুটি মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি, হৃদগগনে পবন হল সৌরভেতে মন্থর"... মনে হচ্ছিল চারিদিক এক অপূর্ব মায়ায় ভরে যাচ্ছে। তার চোখে জল ভরে এল। তিনি অপূর্ববাবুকে জিজ্ঞেস করলেন "এই গান কি ওকে আপনি শিখিয়েছেন?"
অপূর্ববাবু মাথা নাড়লেন, "না মাস্টারমশাই, ও নিজে সারাদিন গান শোনে, তার থেকেই গান শোনায়, আমি গেলে খালি ও রোজ নতুন নতুন কি গান তুলেছে, সেগুলিই শোনায়।"
নিত্যবাবু অভিভূত হলেন। তার দীর্ঘদিনের সঙ্গীতজীবনে তিনি এরকম কণ্ঠস্বর আগে শোনেন নি। মেয়েটি বলল "মাস্টারমশাই এর পরে কি গান করবে?" তিনি কিছুই ঠিক করতে পারলেন না। সিলেবাস গুলিয়ে যাচ্ছিল তার। তিনি বললেন "মা, তোমার পছন্দের যা ভাল লাগে, তাই শোনাও, আমি তাই শুনব।"
মেয়েটি একে একে "কোথা বাইরে দূরে", "রাখো রাখো রে", "সখী আঁধার একেলা ঘরে" "তোমার দেখা পাব বলে এসেছি"এবং সব শেষে ভানুসিংহের পদাবলী থেকে "মরণ রে তুঁহু মম শ্যামসমান" গাইল। নিত্যবাবু ভেবেছিলেন দুটো গান শুনেই রওনা দেবেন। পারলেন না। মেয়েটি কাচু মাচু মুখে বলল এ বারে তাদের সিলেবাসে যে রাগগুলি আছে, সময়াভাবে কোনটাই তোলা হয় নি তার। তিনি একটুও রাগলেন না। বললেন "মা, তোমার গলায় সাক্ষাৎ মা সরস্বতী বাসা বেঁধেছেন।সিলেবাসে কি আছে না আছে তার বিচার তিনিই করুন। তুমি শুধু গান গাওয়া ছেড়ো না। এত অসাধারন গানের গলা তোমার। আমি কোনদিন ভাবতে পারিনি এমন গান শুনতে পারব এখানে এসে।"
পরীক্ষকের কাঠিন্য ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছিল নিত্যবাবুর থেকে।
"এবারে আমি আমার পরীক্ষকের নীতি থেকে বিচ্যুত হলাম। কিন্তু আমি নিরুপায়। সঙ্গীতের কাছে আমার নীতি পরাস্ত হয়েছে আজ অপূর্ববাবু। চলুন আমায় স্টেশনে দিয়ে আসবেন।" মেয়েটি মাথা নিচু করে শুনছিল। এসে প্রণাম করল। নিত্যবাবু অনেক আশীর্বাদ করলেন।অপূর্ব বাবু অভিভূত হলেন নিত্যবাবুর এরকম ব্যবহারে ।

স্টেশনের উদ্দেশ্যে নিত্যবাবু যখন রওনা দিলেন অপূর্ববাবুর বসার ঘরের ঘড়িতে তখন সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। আজ অনেক দেরী হয়ে গেছে তার। দেরী হলেও এই মেয়েটি তাকে হঠাৎ করে অনেক পুরনো কথা মনে পড়িয়ে দিল। এরকম গান তিনি একবারই শুনেছিলেন একজনের গলায়।বাসর রাত্রে কেউ ছিল না সেদিন। একা একা বিয়ে করে এনেছিলেন। গানের শিক্ষক কোনদিন ভাবতে পারেননি তার স্ত্রী অমন গান করে। সারারাত বাকরুদ্ধ হয়ে গান শুনেছিলেন। অনেকদিন পরে পরীক্ষা নিতে এসে আজ একটা ধাক্কা মত খেলেন। আর কি আশ্চর্য, ট্রেনে উঠেই তার মনে পড়ল আজ তাদের বিবাহ বার্ষিকী ছিল। পুরনো ধুলি ধূসর দিনগুলি এভাবেই বুঝি ফিরে আসে বারে বারে...

লাবুর গল্প

চাটুজ্জে বাড়ির বউ যখন এল তখন সবাই চোখ তুলে বউকে দেখছিল। লম্বা টানা টানা চোখ, গমের মত গায়ের রঙ আর সেরকম ফিগার খানি। কোমরটি দেখার মত। চাটুজ্জে বাড়ির ছোট ছেলে ক্ষ্যাপা লাবু লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিল দোতলা থেকে বউদিকে। তার বড়দার পছন্দ আছে। যতই বলা হোক দেশ দুহাজার বারোতে পৌঁছেছে আসলে এ গাঁয়ের লোকজন এখনও অতদূর যায়নি। ছেলে শহরের বউ ঘরে তুলেছে বলে বাড়ির কর্তা অধীর চাটুজ্জের কিছুটা অভিমান ছিল কিন্তু বউমাকে দেখে সে অভিমান দূর হয়েছে। এ গ্রামের জমিদার ছিল এককালে চাটুজ্জেরা। বাড়ি ঘরদোরে জমিদারি রক্ত বোঝা যায়। ব্রাহ্মণ অভিমানও অধীর চাটুজ্জের বড়ছেলে রাখতে পারেনি। তার বউ কায়স্থ ঘরের মেয়ে। তবে পয়সাওয়ালা। ছেলে যখন বাড়িতে বলল অধীর সে রাতে খাননি। তবে এটুকু বুঝেছিলেন আজকালকার দিনের ছেলে পিলেরা বাপের "না" শোনার জন্য বসে থাকে না। আর জমিদারী মেজাজ দেখাতে গেলে সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার ছেলে বাড়িতে এক পয়সাও দেবে না। তাতে সংসার চালানো মোটেও সহজ হবে না। সেই দিন আর নেই। চুপচাপ মেনে নিয়েছিলেন।

এ গ্রামটা বর্ধমান জেলায়। কলকাতা থেকে ২০০ কিলোমিটার দূর। চাটুজ্জে আর খানদুয়েক ঘর ছাড়া সেরকম শিক্ষিত কেউ এ গ্রামে থাকে না। গ্রামটা খুব বেশি বড়ও না। চাষবাসই মূল উপজীব্য। বাম শাসনই হোক কিংবা রাম শাসন শাসকদলের যত উন্নয়ন শহর কেন্দ্রিক হবার দরুন এখনও এ গ্রামের বেশিরভাগ রাস্তা কাঁচা। বেশিরভাগ বাড়ি মাটির তবে ইলেক্ট্রিসিটি আছে। বেশিরভাগ স্ট্রিট লাইট রাত্তিরে জ্বলে না।

লাবু সেই সময়টাতেই বেরোয়। তার বেশ লাগে রাত বারোটার পরে গ্রামে হেঁটে হেঁটে ফিরতে। অধীর বাবুর আক্ষেপের অন্যতম মূল কারণ লাবু। ছেলেটা বড় ছেলে উজ্জল কিংবা মেজ সুনীলের মত মানুষ হল না। আধ পাগলা ক্ষ্যাপা থেকে গেল। লাবুর এই বেরনোর খবরটা অধীর জানেন। প্রথমে রাগারাগি করতেন। পরে দেখলেন চ্যাচামেচি করায় কোন লাভ নেই, তাই ধীরে ধীরে ছেড়ে দিলেন।

দাদার বাসরে লাবু সবার সাথে গোলাপ সাজাল বিছানায়। বউদিকে নিয়ে যখন দাদা ঘরে ঢুকল লাবু ড্যাব ড্যাব করে তাকাল। তার প্রাণের বন্ধু আসলাম আর সে খেতে বসল লাস্ট ব্যাচে। আসলামকে সে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল,"ঘর বন্ধ করে কি করে রে?"

আসলাম ফিস ফিস করে বলল,"কি আর করবে, লুডো খেলে।" বলে খিল খিল করে হাসতে থাকল।

লাবু রেগেমেগে আসলামের পাতের ইলিশ মাছটা খেয়ে নিল।

২।।

জ্যোৎস্না রাতে একটার পর থেকে চাঁদ মনে হয় আরও চকচকে হয়ে যায়। লাবুর অন্তত তাই মনে হয়। গ্রামের শেষে জমি পাহারা দেবার খাটিয়ায় বসে লাবু এই দার্শনিক চিন্তাগুলি করে। এই জমিটা শিবেন জোয়ারদারের। গত বছর ভোটের সময় শিবেন জোয়ারদার এক জবরদস্ত বুদ্ধি করলেন। নির্দল প্রার্থী হয়ে ভোটে দাঁড়িয়ে গেলেন। পাঁচ হাজার টাকা গুনে গুনে দিয়ে পুলিশ স্টেশনে এক লম্বা চিঠি লিখে অভিযোগ করলেন তার প্রাণ সংশয় দেখা দিয়েছে ভোটে দাঁড়াবার পর, সরকার থেকে তাকে সিকিউরিটি দেওয়া হোক। দিন দুয়েকের মধ্যে দুই বন্দুকধারী হাজির হল শিবেন জোয়ারদারের কাছে। তখন ফসল কাটার সময়। শিবেন খাটিয়ায় শুয়ে লম্বা ঘুম আর সারারাত দুই সরকারি পাহারাদার ফসল পাহারা দিত। ভোট হল

তিনমাস পরে। শিবেনের জামানত বাজেয়াপ্ত হল। সরকারি পাহারাদারেরাও চলে গেল। কিন্তু শিবেন বগল বাজিয়ে বলল দ্যাখো আমার কি বুদ্ধি। পাঁচ হাজার টাকায় বন্দুকধারী পাহারাদার তিন মাসে কে দেবে? হে হে হে হে।

সেই থেকে লাবুর ধারনা ছিল শিবেন জোয়ারদার সব চাইতে বুদ্ধিমান লোক। কিন্তু দাদার বিয়ের পর থেকে তার সে ধারনার পরিবর্তন হয়েছে। এত সুন্দর বউ যে আনতে পারে সেই সবচাইতে বুদ্ধিমান। তাদের বংশের মধ্যে দাদাই সব চেয়ে ভাল ছাত্র। এর মধ্যে একবার আমেরিকাও ঘুরে এসেছে। লাবুকে ওখান থেকে একটা দাড়ি কাটার ক্রিম এনে দিয়েছিল। লাবু সারা মুখে মেখে বসে থাকে। বড় ভাল লাগে তার। আমেরিকার ক্রিম। দারুণ ব্যাপার। দাদাকে সে খানিকটা ভয়ও করে। ছোটবেলায় দাদা তাকে খুব পেটাত পড়া পারত না বলে। সেই ভয় থেকেই দাদাকে জিজ্ঞেস করতে পারেনি আমেরিকার চাঁদ কি রাত একটার পরে বেশি চকচক করে। যদি পেটায়!

লাবু প্রতিরাতেই তিনটের সময় ঘরে শুতে আসে। আজ দেরি করল। বাড়িতে পেছনের দরজা দিয়ে যখন ঘরে ঢুকছিল পরিষ্কার শুনতে পারছিল বড়দা বউদি নিচু গলায় ঝগড়া করছে। দাদা চাপা গলায় বলছে,”অন্তত একমাস তো তোমায় থাকতেই হবে এখানে, বিয়ে করে এসেছি, আমি না হয় প্রতি উইক এন্ডে একবার করে আসব।“

বউদি সাপের মত নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলছে,”এই শর্তটা বিয়ের আগে দিতে পারতে, তোমার থেকে শান্তনুই তবে বেটার অপশন ছিল, অ্যাটলিস্ট ওদের তো কোন ধ্যাদ্ধেরে গোবিন্দপুরে বাড়ি নয়।তার উপর মান্ধাতার আমলের বাড়ি। ভুতুড়ে বাড়ির মত লাগে। মাগো!“

দাদাও কম নয়, সেও ফোঁস করল,”হ্যারে মাগী, তোর যত অপশন এখনই দেখতে পাই, এতদিন তাহলে সব জেনে শুনে এখানে কি ছিঁড়তে এলি!”

ঝাড় খেয়ে বউদির গলাটা একটু নামল মনে হল,”এখানে স্যানিটারি ন্যাপকিন আমি কোথায় পাব। আগে বলতে পারতে, সেরকম স্টক আনলাম না।“

দাদা আদুরে গলায় বলল, “ সে আমি এনে দেব সোনা, এখন চল ঘুমোই।“

লাবু চুপচাপ সরে এল। স্যানিটারি ন্যাপকিনের মানেটা আসলাম জানে কিনা কে জানে!

৩।।

“তোর বউদির বুকখানা মাইরি দারুণ। তোর দাদা শালা কি যে করে, এমন বউ কেউ রেখে যায়!”

আসলামের কথা শুনে লাবু বুঝে উঠতে পারে না তার কি করা উচিত। ওকে তাড়া করে মারা যায়। কিন্তু এই সাত সকালে অত দৌড়ঝাঁপ তার পোষাবে না। সে শান্ত চিত্তে দাঁতন করতে লাগল। আসলাম আরও ঝুঁকে এল, “কি বে, তোর দাদার ঘরে উঁকি ঝুকি মারলি?কি করল দেখলি?” লাবু বুঝতে পারল না কাল রাতের ঘটনা আসলামকে বলা ঠিক হল নাকি। কিন্তু ওই যে কি ন্যাপকিন বলল ওটা বলতে আসলাম বলল ওটা ন্যাকড়ার মত। তুই বুঝবি না। লাবু ফিক ফিক করে হাসছিল। সে বুঝেছে আসলামও অতটা জানে না। এমনিতে আসলাম হাব ভাব দেখায় সব জান্তা। ব্যাটা আসলে যেটা জানেনা সেটাও রঙ চং মাখিয়ে বলতে ওস্তাদ। ওই তো গেল বছর আসলাম বলল জয়দেবের মেলায় সাইকেল করে যাবে। দুজন মিলে উদ্যোগ করে বেরিয়েওছিল। আসলামের কথায় ভেবেছিল আধঘণ্টা লাগবে। এ গ্রাম সে গ্রামের ওপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে প্রায় ঘণ্টা তিনেক পরে পৌঁছেছিল। তখন রাত আটটা বাজে। মেলা বলতে সব বাউলদের ঠেক আর নদীর চরে সারি সারি পায়খানা। বাড়ির কথা ভুলেই গেছিল লাবু। সারারাত বাউল ঠেকে গান শুনে আর মেয়ে বাউলের নৃত্য দেখে চোখ জুড়িয়ে গেছিল তার। পরদিন বাড়ি পৌঁছালে বাড়িতে কম মার খেতে হয়নি বাবার কাছে। তবে লাবু আসলামের কথা বলেনি। আসলামকে সে খুব ভালবাসে। আসলামও তাকে কম

বাঁচায়নি। পদ্মফুল আনতে গিয়ে চিতি সাপের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। পঞ্চাননতলার বটগাছের নীচে পাগলা কুকুরটা তাড়া করেছিল লাবুকে। সেটাকে ইট দিয়ে মেরে মাথা গুঁড়ো করে দিয়েছিল আসলাম।

তবে ব্যাটা মাঝে মাঝে বড্ড উলটো পাল্টা কথা বলে। তার বউদিকে নিয়ে এসব কথার কি দরকার। এমনিতে তার সাথে বউদি তো খারাপ ব্যবহার করেনি। তাকে ডেকে একদিন তত্তের মিষ্টি দিল। জিজ্ঞেস করল কোন ক্লাস অব্দি পড়েছে। তার মাথায় হাতও বুলিয়ে দিয়েছে। লাবুর একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। তারপর বাতাবি লেবু আনার নাম করে পালিয়েছে সেখান থেকে। তবে বউদি আসার পর লাবুর সারাক্ষণই বউদির সামনে সামনে থাকতে ইচ্ছা করে। যখন সে সুপারি গাছে ওঠে তখনও মনে হয় বউদি থাকলে ভাল হত। তাকে দেখত। মুসলমান পাড়ায় ফুটবল খেলতে যাবার সময় মনে হয় ইস বউদি যদি দেখত সে কত সুন্দর খেলতে পারে।

তবে লাবু ক্ষ্যাপা হলেও এসব কথা আসলামকে বলে না। সেও বুঝতে পারে, কিছু কিছু কথা আসলামকে বলার নয়।

৪।।

ঘটনাটা ঘটল বুধবার রাত্রিবেলা। দুটোর সময় লাবু ফিরছিল পেছনের দরজা দিয়ে। ঘরে ঢোকার সময় দেখল তার ঘরে বউদি বসে। লাবু কি করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। সে আমতা আমতা করল, “ কি খবর বউদি, কেমন আছ?” লাবুর ঘরটা অন্ধকার থাকে। এখন সেরকমই ছিল। সে বুঝতে পারছিল কিছু একটা ঘটতে চলেছে। বউদি উঠে তাকে আচমকা জড়িয়ে ধরল। লাবু অবশের মত হয়ে গেল। তবু ওই সময়ের মধ্যেই বউদিকে টান দিয়ে সরিয়ে দেয়। ঘর থেকে একপ্রকার ঠেলেই বের করে দেয় বউদিকে। ছিটকিনি আটকে হাক পাক করে নিঃশ্বাস নেয়।

৫।।

আসলাম এই সতেরো বছর বয়সেই রোজা করে। রোজার সময় আসলামের চোখ নাক মুখ দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সময় কোন অপবিত্র কথা শোনা, বলা পাপ।লাবু আসলামের সাথে সাথে ঘোরে। সাপের খোলস দেখে, পোড়া অশ্বত্থ গাছের ডালে ডালে পাখির বাসা খুঁজে বেরোয়, মাঝে মাঝে শিবেন জোয়ারদারের খাটিয়ায় গিয়ে বসে দুজনে মিলে। দাদা বউদিকে নিয়ে গেছে মাস খানেক হল। সেই ঘটনার পর বাড়িতে থাকা একপ্রকার ছেড়েই দিয়েছিল লাবু, সব সময় সচকিত থাকত বউদির সাথে যেন কোন প্রকারে চোখাচুখি না হয়ে যায়। সাইকেল চালিয়ে অজয়ের তীরে গিয়ে বসে থাকত। শ্রাবণের ঘোর বৃষ্টিতেও এ গ্রাম সে গ্রাম একা একা ঘুরে বেরাত চাটুজ্জে বাড়ির ছোট ছেলে। দাদার যাবার সময় দাদা বউদিকে প্রনাম করার সময় বউদির চোখের কোণায় জল দেখতে পেয়েছিল লাবু।

এখন অনেকেই বলে লাবু চালাক হয়ে গেছে, সেই খ্যাপামি অনেক কমে গেছে। লাবু কিন্তু এখনও রাত একটার পর জ্যোৎস্নার চাঁদ বেশি চকচকে দেখে। শুধু মাঝরাতে ঘরে ঢোকার সময় টর্চ জ্বেলে ঘর দ্যাখার উপসর্গ যুক্ত হয়েছে লাবু খ্যাপার খ্যাপামিতে। বাকি সব ঠিকই আছে।

জন্মদিনের গল্প

তখন ক্লাস নাইন। পড়াশুনো ধীরে ধীরে সেকেন্ড গিয়ারে উঠছে। এক বন্ধুর বাড়িতে পড়তে যেতাম। সে আমাদের ক্লাসের থার্ড বয়। আমি সারা বছর পড়তাম না। যত পড়া পরীক্ষার আগে। তা সত্ত্বেও কোন এক ম্যাজিকে দশের মধ্যে থেকে যেতাম। আমার নিজের মধ্যেও একটা লক্ষ্য মাত্রা ঠিক করা ছিল। এক থেকে দশের মধ্যে থাকলেই হল। বিরাট কোন লক্ষ্য ছিল না। একবার বোধ হয় বাংলায় ৫৪ পেয়েছিলাম। এত কম নম্বরে খুব মুষড়ে পরেছিলাম। সব সাবজেক্টে ৭০ করে পেলেই খুশি থাকতাম। বাড়ি থেকেও খুব একটা চাপ দিত না।

যে বন্ধুর কথা বলছিলাম তার নাম ছিল অরিন্দম। তাদের বাড়িতে এক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ইংরেজি পড়াতে আসতেন। উনি শুধু প্রোজ আর পোয়েট্রি মুখস্থ ধরতেন। তা সত্ত্বেও ক্লাসগুলি জোলো ছিল না কারণ উনি আমাদের সাথে বন্ধুর মত মিশতেন। আমরা ছোট ছিলাম বলে মনে হত না। সব ব্যাপারে ওনার সাথে বয়স্কের মত কথা বলতাম। মনে আছে একবার খুব ঘ্যাম নিয়ে বলেছিলাম, "স্যার, মহাভারত পড়ে জানলাম বেশিরভাগ লোকই বাবার ছেলে নয়"। একমাত্র তখনই শুনে গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন "সেটা বুঝতে আরেকটু বড় হতে হবে"।

স্যার নোটস দিতেন না। নিজে থেকে প্রশ্নের উত্তর লেখার ব্যাপারে জোর দিতেন। এটা পরবর্তীকালে বেশ কাজে লেগেছিল।

অরিন্দমের বাড়ি যাবার পথে পড়ত আমার তখনকার ব্যথার বাড়ি। সাইকেল চালিয়ে তিন তলার বাড়িটা দেখতে দেখতে আসতাম। কখনও কখনও দেখাও যেত। দেখতে পেলেই যে কি আনন্দ হত সেটা আর বলে বোঝানো যাবে না।

অরিন্দম আমি আর তন্ময় বলে একটা ছেলে পড়ত আমাদের ব্যাচে। আমি চিরকালই পড়ার বইয়ের থেকে গল্পের বইই বেশি পড়তাম। মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি, গোঁসাই বাগানের ভূত, টেনিদা, সূর্য কাঁদলে সোনা সারাক্ষণ মাথায় ঘুরপাক খেত। আর খুব গোপনে লুকিয়ে রাখা তখনকার ব্যথা।

আমি আর তন্ময় ছিলাম খুব বন্ধু। সাইকেল চালিয়ে এলাকা ঘুরে বেড়াতাম বিকেলে নিয়ম করে। যে লেভেলে সাইকেল চালিয়েছি, এখন ভাবা যায় না।

এক বুধবার পড়তে পড়তেই অরিন্দম বলল আসছে রোববার ওর জন্মদিন। তারপর আর কিছু বলল না। সে সময়টা আমাদের সবারই জন্মদিনে লুচি মাংস পায়েস হত। বেশ মজাদার ছিল। আর কারও জন্মদিনে বন্ধুদের বলা তো অবধারিত ছিল। পড়া থেকে বেরিয়ে আমি তন্ময়কে বললাম," কি রে, অরিন্দম কি রোববারের নেমন্তন্ন করল?" তন্ময় বলল," বলল যখন করল নিশ্চয়ই"। আমি বললাম,"পুরোপুরি তো কিছু বলল না"। তন্ময় বলল," তাহলে নিশ্চয়ই বাড়ি গিয়ে করে আসবে দেখিস"। আমারও তাই মনে হল। বিশেষ করে অরিন্দমের পরিবারের সাথে আমাদের পরিবারের বিশেষ সখ্যতা আছে। অরিন্দমের বাবা- মার বিয়েটা আমার দাদু করিয়েছিলেন। সেটা অরিন্দমের বাবা – মাও প্রায়ই বলেন।

আমি বাড়ি ফিরে বাবাকে বললাম গিফটের জন্য। রোববার অরিন্দমের জন্মদিন, ভাল কিছু দেওয়া প্রয়োজন। বাবা বলল ঠিক আছে আগে রোববার আসুক। বাড়িতে সবাইকেই বললাম অরিন্দমের জন্মদিন। মা বলল পয়লা বৈশাখে কেনা নতুন পাঞ্জাবিটা তো এখনও পড়িস নি। ওটাই পড়ে যাবি।

আসলে অরিন্দম তখন সবে সবে বন্ধু হয়েছে, এর আগে ওর জন্মদিনে কখনও যাই নি, এবারই প্রথম তাই উৎসাহটা বেশি।

আমার জন্মদিন অক্টোবরের ১০ তারিখ। চিরকালই কোন না কোন অনুষ্ঠানের মধ্যে। চিরকাল ছুটি ছাটার মধ্যে জন্মদিন পড়ে। আমাদের স্কুলে যার জন্মদিন হত, তার বাড়ি থেকে লজেন্স পৌঁছে দিত স্কুলে। আমার জন্মদিন চিরকাল ছুটির দিনে পড়ত বলে আমার দুঃখ ছিল। দেখা গেল অরিন্দমের জন্মদিন আমার জন্মের ২৫দিন আগে।
সেপ্টেম্বর মাস। বর্ষা বিদায় নেব নেব করছে। মাঝে মাঝেই শরতের নীল আকাশ উঁকি দিচ্ছে। অরিন্দমদের পাড়ায় মস্ত দুর্গাপূজা হয়। বাঁশ পড়ে গেছে প্যান্ডেলের। পুজোর কেনাকাটাও শুরু পুরো দমে। আমার আর তন্ময়ের তখন পূর্ণ উড়ু উড়ু ভাব। রাস্তায় সাইজের মেয়ে দেখলেই উদাস চোখে তাকাই। যেন আমরা কত উপেক্ষা করছি। ক্লাসের সায়ন তখন আমাদের চোখে হিরো। আদর্শের সাহানা ওকে হলুদ গোলাপ দিয়েছে। ওর গল্প শুনি আর দীর্ঘশ্বাস ফেলি।
বৃহস্পতিবার এল। অরিন্দমদের বাড়ি গিয়ে ভাবছি এই হয়ত ওর বাবা কিংবা মা বলবে "তোরা রোববার বিকেলে এখানেই খাবি।" রোববার আমাদের পড়া থাকত না ওদের বাড়িতে সুতরাং নেমন্তন্ন করার দরকার ছিল বৈ কি।
কিন্তু না, বৃহস্পতিবার গেল, শুক্রবার গেল, শনিবার গেল নো ইনভিটেশন।ওদিকে আমাদের বাড়িতে গিফট কেনাও হয়ে গেছে। তন্ময় আবার ঠারে ঠোরে অরিন্দমকে ইঙ্গিত দিচ্ছে "এই রোববার একটু হাবরা যাব, একটু কাজ আছে", ভাবছে অরিন্দম বোধহয় বলবে কোথায় যাবি, সেদিন ফাঁকা রাখবি, কিন্তু কোথায় কি! কিছুই তো বলেনা ছেলে! রোববার বারাসাত যাবে বলে মা ঠিক করেছিল পুজোর কেনাকাটার ব্যাপারে। আমি না করে দিয়েছিলাম। রোববারের নেমন্তন্নের আরও একটা দরকার ছিল সেটা হল সেদিন রাত আটটায় ভৌতবিজ্ঞান পরীক্ষা ছিল। আমি আর তন্ময় একটা স্যারের কাছে ভৌতবিজ্ঞান পড়তাম। রোববার বিকেল পাঁচটায় মনমরা হয়ে আমি আর তন্ময় ভাবছিলাম আজ নেমন্তন্নটা হলে পরীক্ষাটা দিব্যি কাটিয়ে দেওয়া যেত। আমার বাবাও বুঝতে পারছে ছেলের মাথা গরম আছে। বাবার সাথে আমি আর তন্ময় বসেছিলাম।
বাইরে হঠাৎ বেল বাজল। বাবা বলল দেখ কে এসছে। হয়ত শেষ মুহূর্তে অরিন্দমের বাড়ির কেউ ডাকতে এসেছে। আমরা দুই হ্যাংলা লাফাতে লাফাতে দরজা খুলে দেখি ভৌতবিজ্ঞান স্যার। বিকেলেই হাজির। তার নাকি অরিন্দমের বাড়িতে নেমন্তন্ন আছে। অরিন্দমকে উনি প্রাইভেটে পড়াতেন। আমাদের প্রশ্ন দিয়ে কেটে পড়লেন। বাবাকে বলে গেলেন, "একটু দেখবেন তো দাদা"। রোববার বাবার অফিস ছুটি। বিকেলে কি করবে বুঝতে পারছিল না। আমাদের দুই বেচারাকে পেয়ে খুশিই হল। আমি তন্ময়কে বললাম,"ভাই এই অপমানের বদলা কি করে নেওয়া যায় বলত?"
তন্ময়ের জন্মদিন ডিসেম্বর মাসে। সুতরাং যা করার আমার জন্মদিনের সময়ই করতে হবে। দ্রুত একশান দরকার। দেরী করলে চলবে না।
পরের বুধবার পড়তে গেলাম অরিন্দমের বাড়ি। আমাদের মুখ গোমড়া। চুপচাপ পড়ে চলে এলাম।
মা জিজ্ঞেস করল পূজায় কি নেব? বললাম কিচ্ছু চাই না। খালি এবার আমার জন্মদিনটা বড় করে কোর। মা বুঝেছিল অরিন্দমের বাড়িতে আমাদের বলে নি বলে আমি খুব কষ্ট পেয়েছি তাই কিছু বলল না। রাজি হয়ে গেল।
পরের দিন স্কুল ছুটি হবে। আমি অরিন্দমকে বাদ দিয়ে আমাদের গ্রুপের সবাইকে নেমন্তন্ন করলাম। তন্ময় আর আমি রোজ অরিন্দমের বাড়ি গিয়ে আমার জন্মদিনের প্ল্যান করি। আমাদের ইংরেজি স্যারকেও বললাম। কিন্তু অরিন্দমকে বললাম না। আমার জন্মদিনও খুব ধুমধাম করে পালিত হল। অরিন্দমের মুখ গোমড়া। আমার প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে গেছে।
আমি তন্ময়কে বললাম তুই কিন্তু জন্মদিনে অরিন্দমকে বলিস না। তন্ময় বলল সে আর বলতে। কিন্তু চমকটা খেয়েছিলাম ওদের বাড়িতে পৌঁছে। গিয়ে দিব্বি দেখছি অরিন্দম বসে আছে। আমার দিকে তাকিয়ে মিচকে

মিচকে হাসছে। আমি দুম দাম করে বেরিয়ে গেলাম তন্ময়দের বাড়ি থেকে। খাই নি সেদিন। এখনও মনে আছে।

#

তারপর দেড় যুগ কেটে গেছে। অরিন্দম এখন বেঙ্গালুরুতে। তন্ময় গুজরাট। নিজেদের জন্মদিনের দিন নিজে নিজে কাটাই। কোন কোনদিন কাজের চাপে ভুলেও যাই আজ আমার জন্মদিন ছিল। মা এলে মাঝে মাঝে পায়েস করে।

সেই ঘটনার পরের বছর থেকে প্রতি জন্মদিনেই ও আমাদের বলে। পরে জেনেছিলাম সে বছরটা ওদের অশৌচ ছিল বলে পরিবারের কয়েকজনকে নিয়ে শুধু গেট টুগেদার করেছিল। ভৌতবিজ্ঞান স্যার ওর নিজের পিসেমশাই সেটাও পরে জেনেছিলাম। সেই অনুশোচনা আমার এখনও যায়নি। অরিন্দম সেদিন ফেসবুকে ওর জন্মদিনের ফটো আপলোড করেছিল। আমায় ট্যাগ করেছিল। অনেকদিন পরে কেকে ঢাকা অরিন্দমের মুখের ফটোর নিচে লিখেছিলাম "সরি ভাই। এদিকে এলে সময় করে আসিস আমার জন্মদিনে। এক সাথে কেক খাওয়া যাবে"। আর কিছু লিখতে পারিনি।

তবে মাইরি বলছি, তন্ময়ের উপর রাগ আমার এখনও যায় নি!!!

বিমলবাবুর একদিন

১৪ই আষাঢ় বিমলবাবু হঠাৎই ঘুম থেকে উঠে দেখতে পেলেন তিনি একটি বিছানা বালিশহীন কাঠের খাটের মধ্যে শুয়ে আছেন। ঘুম জড়ান চোখেও অবশ্য বুঝতে অসুবিধা হল না সেটা বাবার আমলের সেই আসল মেহগিনি খাটটা। চোখ মেলে চারদিক দেখলেন তিনি। দেওয়ালে ক্যালেন্ডারে কাগজটা হাওয়া। শুধু ফিনফিনে রডটা ঝুলছে সুতোহীন অবিশ্বাস্যভাবে। টেবিলটা নেই। শুধু ওর ওপরের বইগুলি কভারহীন ভাবে আশ্চর্য ভঙ্গিমায় শূন্যে ভাসমান। টিভিটার পিকচার টিউব দেখা যাচ্ছে খালি। আলমারি হাওয়া শুধু জামাকাপড়গুলি শূন্যে ভাসছে। টিউবের আলো আছে, টিউব নেই। হাওয়া আছে, ফ্যান নেই।

#

বিমলবাবু অকৃতদার। সুতরাং তিনি ভয় পেলেন না। উঠে বাথরুমে গেলেন। অদৃশ্য কলের জলে মুখ ধুয়ে বাইরের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালেন। আজ হল কি?

বিমলবাবু দেখলেন তার সন্তোষপুরের জমজমাট পাড়া ছেড়ে তিনি একটা খাখা মরুভূমির মত জায়গায় দাঁড়িয়ে। তবে বালি নয়, মনে হচ্ছে বালির রঙের একটা চকচকে হলদে চাদর কেউ সামনে পেতে দিয়েছে। আকাশ দেখা যাচ্ছে না। মাথার উপরে কতগুলি আলোর রশ্মি বাড়ছে, কমছে। এই অস্বস্তিকর পরিবেশে বিমলবাবু বুঝলেন না কি করবেন। এমনিতে বিমলবাবু লোকটি একটু কমই চমকান। বিস্মিত হবার ক্ষমতাও কম। কলেজ লাইফে তিনি চুটিয়ে প্রেম করতেন। তারপর একদিন হঠাৎ করে একদিন জানতে পারলেন তার প্রেমিকা সুমনা তার মতোই আরও একটি ছেলের সাথে প্রেম করছিল এবং বিয়ে টিয়ে করে পগারপার হয়ে গেছে। সেই সময়টায় তিনি এতটাই বিস্মিত হয়েছিলেন কিভাবে একটি মেয়ে এত মুন্সিয়ানার সাথে ডুয়াল সিম ব্যবহার করতে পারে যে তার গোটাজীবনের বিস্মিত হবার কোটাটাই পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়টাই তিনি বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেন। বর্তমানে কেষ্টপুরের পিসিমা তার ননদের মেয়ের জন্য ফোন করে রোজই ঘ্যানঘ্যান করেন। বিমলবাবু সুকৌশলে কাটিয়ে দেন।

নিজের মত দশটা পাঁচটা অফিস করেন। বাড়ি ফিরে খবর টবর দেখে হোম ডেলিভারির খাবার খেয়ে চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়েন। কোন নেশা নেই, কোন দোষ নেই, শুধু মাঝে মাঝে মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে বসে থাকেন। মনটা বড় হুহু করে। বড় একা লাগে। তারপর জলটল খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েন।

#

এহেন বিমলবাবু ১৪ই আষাঢ় ঘুম থেকে উঠে চারদিকের পৃথিবীর পরিবর্তন দেখে বিস্মিত হলেন না। তবে একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হলেন। "অফিসটা বোধহয় আজ আর যাওয়া হল না"। ভাবলেন তিনি। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর বালির রঙের হলুদ চাদরের ওপর হাঁটতে শুরু করলেন বিমলবাবু।

#

তার একটু খিদে খিদে পাচ্ছিল। তিনি ভাবছিলেন একটু লুচি আলুরদম হলে মন্দ হত না। ভাবার সাথে সাথেই তিনি দেখতে পেলেন একটু দূরে চাদরের ওপর ধপধপে সাদা লুচি আর আলুরদম। প্লেটের কোণে আবার একটা জলভরা তালশ্বাসও উঁকি মারছে। বিমলবাবু এগিয়ে যেতেই দেখলেন প্লেটের খাবার হাওয়া। শুধু প্লেটের ওপর কিছু ময়দা, চারটে আলু, আর কিছু চিনি পড়ে আছে। তারপরে সেগুলিও অদৃশ্য হয়ে গেল। মরীচিকা নাকি? ভাবলেন একবার। তার পেটটা ভরা ভরা লাগছিল। মনটা খুশি হয়ে উঠল বিমল বাবুর। ভরা পেটে থাকলে আর কোন চিন্তা থাকে না। যত চিন্তা তো এই খিদে নিয়েই। তার ফুর্তি হল খুব। তিনি দুবার লাফিয়ে নিলেন চাদরের ওপরে। চারদিক তাকিয়ে একটু গড়িয়েও নিলেন।

#
বিমলবাবুর মনে হল আজ ভারত পাকিস্তানের ক্রিকেট ম্যাচ ছিল। খেলাটা দেখতে ইচ্ছে করছিল তার। ভাবতে না ভাবতেই একটা বিরাট স্ক্রিন উদয় হল সামনে। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন টস হচ্ছে। কিন্তু আরেকটু মনোযোগ দিতেই দেখলেন স্ক্রিন উধাও। দপ করে অখণ্ড ভারতের মানচিত্র উদয় হয়ে আবার উবে গেল।
#
বিমলবাবু বুদ্ধিমান লোক। তিনি বুঝতে পারলেন এখানে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায় অন্তত কিছু সময়ের জন্য। তিনি হলদে চাদরের উপর দাঁড়িয়ে চিন্তা করলে লাগলেন কি চাওয়া যায়? সেই ছোটবেলার ঠাকুমার আমসত্বের আচার? শীতকালে কাঁচা কুলের টক ঝাল মাখা? নাকি প্রথম কৈশোরের সেই লাল সাইকেল যেটা ও পাড়ার হরিপদ রোজ চালিয়ে যেত আর তিনি জুল জুল করে চেয়ে দেখতেন? অখিলেশের দামী মোবাইলটাই বা মন্দ কি?
বিমলবাবু এই বাতানুকুল পরিবেশেও ঘামতে লাগলেন। তিনি ঠিক করতে পারলেন না কি চাইবেন। কিছুই ঠিক করতে না পেরে অবশেষে একে একে সবই চাইতে লাগলেন। কোনবার মুখ টক, কোনবার মিষ্টি, কখনও দেখলেন একটা লাল সাইকেল, পরক্ষনেই কিছু লোহালক্কড় আর লাল রঙ, কখনও একটা ক্যামেরা মোবাইল আর তার পরেই কিছু ধাতু।
#
বিমলবাবু একটু ক্লান্ত হলেন। বসলেন হলুদ চাদরের উপরে। হঠাৎ তার মন মাঝরাতের মত হুহু করে উঠল। বুকটা টনটন করে উঠল।
তার সুমনাকে দেখতে ইচ্ছা করল। সেই সুমনা। যে তার সাথে দুবছর প্রেমের নাটক করে ফিলজফি অনার্সের অমিতাভকে বিয়ে করেছিল। তারপর কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছিলেন তিনি। কতবার তার মনে হয়েছে এই সুমনা ছাড়া তিনি পাগল হয়ে যাবেন। এখনও মাঝরাতে উঠে বসে থাকেন। সেই সুমনাকে একবার দেখার বড় ইচ্ছা হল তার।
ভাবতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল একজন স্থুলকায়া মহিলা। গর্ভবতী মহিলার মত ভুঁড়ি। মুখটা পান খেয়ে লাল। এই সেই সুমনা? বিমলবাবুর মুখটা এবার নিজে থেকেই তেতো হয়ে গেল। তবু ভাল করে দেখার জন্য সামনে যেতেই দেখতে পেলেন দপ করে সুমনা উবে গিয়ে একটা কঙ্কালে পরিণত হল। তারপর কিছু লাল, সবুজ, হলুদ বাস্প হয়ে উবে গেল।
#
তিনি আবার বসলেন। ক্লান্ত অবসন্ন লাগছিল বড়। ঘুমিয়েই পড়লেন শেষতক।
#
১৫ই আষাঢ় ঘুম থেকে উঠে বিমলবাবু দেখতে পেলেন তিনি সেই একই খাটে শুয়ে আছেন, সেই একই বিছানা, সেই কোলবালিশ, টি ভি সেই টি ভির জায়গাতেই আছে। বিমলবাবু এবারও বিস্মিত হলেন না। তবে উঠে তিনি একটা ফোন করলেন। কেস্টপুরের পিসিমাকে জানিয়ে দিলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে। একা থাকা তার আর পোষাচ্ছে না।
#
মনে মনে বললেন, সবই যখন কঙ্কাল আর কিছু লাল সবুজ হলদে ধোঁয়া তখন আর জীবনভর দেবদাস থাকার মানে কি?
#
শোনা যায়, এক মেয়ে আর গিন্নি নিয়ে বিমলবাবু এখন সুখেই সংসার করছেন।

ঢাকাই জামদানি

আমার মাঝে মাঝে বড় বিরক্ত লাগে। এখন যেমন লাগছে সামনে পারমিতাদিকে দেখে। ছেলেকে নিয়ে এত আদিখ্যেতা করে! " আমার পিঙ্কু এই করেছে, ওই করেছে"। যেদিন থেকে অফিসে জয়েন করেছি পারমিতাদির খালি একই বচন শুনে শুনে কান পচে গেল। আর হলই বা তোর ছেলে বিরাট স্কলার তাতে আমার কি? সকাল সাড়ে দশটা থেকে বিকাল সাড়ে চারটে ননস্টপ। সামনে পিঙ্কুর বিয়ে। এখন ওই নিয়ে পড়েছে। পিঙ্কুর পছন্দ করা মেয়ে তুহিনা। সে নাকি বিরাট ডাকসাইটে সুন্দরী। ওনার ছেলে মেয়ে তুলেছে তাতেও পারমিতাদির মাটিতে পা পড়ছে না। ব্যালেন্স সীট মেলাতে মেলাতে মাঝে মাঝে মনে হয় দিই আচ্ছা করে ঝেড়ে। কিন্তু সেটা করা যায় না। স্বামী মারা গেছেন বহুদিন। ভদ্রমহিলা ডেথ কেসে চাকরি পেয়েছেন। ছেলেই সব।

মাঝে মাঝে খারাপও লাগে। তবে কাণ্ডকারখানাগুলো বড় বিরক্তিকর। সেদিন একটা পার্কার পেন এনে গোটা অফিসকে দেখিয়ে বেরিয়েছে। সেটা নাকি পিঙ্কুর অফিসের বস ওকে খুশি হয়ে দিয়েছে। এসব দেখে কার মাথার ঠিক থাকে! আমার সাতজনের পরিবার। তিন বোনের বিয়ে বাকি। বাবার পেনশনের আর আমার চাকরির টাকা ভরসা। এত টানাপোড়েনের সংসারের প্রতিনিধিত্ব করতে করতে পারমিতাদির মত ঝাড়া হাত পা টাইপ মহিলা দেখলে মন খারাপ হয়। হিংসা হয়। কি আনন্দে আছে! দুজন পরিবারের সাকুল্যে। দুজনেই চাকরি করে। ছেলে বছরে বারো না তেরো লাখ টাকা পায়। মা সরকারি চাকুরে। আর কি চাই।

পাশের ডেস্কের শিবাজীদা কিংবা ট্যাক্সের সাইদুলও ক্যান্টিনে আমার সাথে বসে পারমিতাদির বাপ-চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে। সাইদুল রোজা করছে। কিছু খায় না। কিন্তু লাঞ্চের সময় ঠিক আমার সাথে চলে আসে। আড্ডা না মারলে নাকি ওর অফিস পানসে লাগে। ওই বলছিল " আরা পিঙ্কুদিকে নিয়ে সত্যি সমস্যায় পড়া গেছে। আমি গেলাম কালকে ওর ফাইলে কি হয়েছে বলতে। যেতেই বিয়ের মেনু নিয়ে এক লম্বা কাহিনী ফেঁদে বসল। চিকেন মাটন দুটোই নাকি রাখবে বলেছে পিঙ্কু। তা আমি এ ব্যাপারে কি করব বল?" রীতিমত কাঁদো কাঁদো শোনাল সাইদুলের গলা। শিবাজীদার অভিজ্ঞতা অন্য। ও পারমিতাদিকে জিজ্ঞেস করতে গেছিল সামনের বন্ধে অফিসে আসবে নাকি। তাতে পারমিতাদি ওকে সাতপাতা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। পিঙ্কুদের অফিসে দিনরাত কাজ হয়। আমেরিকার সাথে চব্বিশ ঘণ্টা যোগাযোগ রাখতে হয়, তাতে বন্ধের কোন জায়গা নেই ইত্যাদি ইত্যাদি। বিরক্তির শেষ সীমা যাকে বলে।

আমাদের অফিসের বড়বাবু পর্যন্ত পারমিতাদির জ্বালায় অস্থির। আজকাল কর্পোরেট অফিসগুলো কি রকম এগিয়ে গেছে, তার তুলনায় সরকারি অফিসগুলো কি বিচ্ছিরি। বড়বাবু কেন এখনও টাই পড়েন না পিঙ্কুদের অফিসের বসের মত এই সব কথাও বলা হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে কেচ্ছার একশেষ।

এখন সামনের সপ্তাহে পিঙ্কুর বিয়ে। পারমিতাদিকে আর পায় কে! আমরা অনেক ষড়যন্ত্র করে পারমিতাদিকে বোঝাতে গিয়েছিলাম সামনে ছেলের বিয়ে, এত বড় কাজ, ছুটি নাও না। সমস্ত আশা ব্যর্থ করে পারমিতাদি জানিয়ে দিয়েছে এখন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট গ্রুপই সব করে। উনি খামোখা ছুটি নষ্ট করবেন কেন? বিরাট বিয়েবাড়ি ভাড়া করেছে পিঙ্কু। সাইদুল ফুট কাটতে গিয়েছিল নলবনে করতে পারতে। আমার রাম চিমটি খেয়ে নিরস্ত হয়েছে।

বিয়ের আগে মোটামুটি খান পঞ্চাশেক বার মেনু আর মেয়ের বাড়ি থেকে কি কি দেওয়া হবে তার ফিরিস্তি পেলাম। বিয়ের পাঞ্জাবী আর বউভাতের স্যুট এমনকি বাসরঘরে পিঙ্কু তুহিনাকে কি ডিজাইনের আংটি দেবে সেটাও জেনে গেলাম। কৌতূহল না থাকলেও জানতে বাধ্য হলাম বলা চলে।

পিঙ্কুর বিয়েটা সত্যিই ভারী ধুমধাম করে হল। আমরা সব দল বেঁধে গেলাম। মোগলাই, চাইনিজ, বাঙালী সব রকম খাবারের আয়োজন। একদিকে মকটেল পার্টি, একদিকে কাবাব বার- মানে চারিদিকে একেবারে অবাধ টাকা খরচ। বউ সত্যিই ভারী সুন্দর হয়েছে। পিঙ্কুর শ্বশুরবাড়ির লোকজনকেও দেখলাম দামী স্যুট বুট পড়ে ঘোরাফেরা করছে। চোখে ধাধা লেগে গেল। পিঙ্কুর অফিসের লোকেদের কর্পোরেট লুকসের সামনে সত্যিই আমাদের কেমন বেখাপ্পা লাগছিল। আমাদের অফিসের সাইদুল কিংবা আমি লোকাল মেড টেইলারের জামা কাপড় পড়ি। পিঙ্কুদের অফিসের এক একজন যে সব জামা পড়েছে দেখলাম তার কোন কোনটার দাম আমাদের কারও কারও মাস মাইনেকেও ছুঁয়ে ফেলতে পারে।
পারমিতাদি যথারীতি কলকল করে চলেছে। আমার কানে কানে এসে বলে গেল, " গোলাপজামটা অবশ্যই খাবি। পিঙ্কু স্পেশাল অর্ডার দিয়ে বানিয়েছে।" বলতে যাচ্ছিলাম, পিঙ্কু নিজে বানায়নি তো? বলার সুযোগ হল না। লোকাল এম এল এ কে অভ্যর্থনা করতে ছুটল পারমিতাদি। খাওয়া দাওয়ার পর বিশাল বিয়েবাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ কেন জানি পারমিতাদির জন্য বিরক্তি হিংসা কোনটাই লাগছিল না। বরং ভাল লাগছিল। আমরা সিগারেট ধরিয়ে এই আলোচনাই করছিলাম আর নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছিলাম এই নিয়ে এরপর পারমিতাদিকে আর অফিসে ধরে রাখা যাবে না। জ্বালিয়ে পুরিয়ে মারবে। কি পেল কি দিল সব শুনতে হবে। কটা কোলবালিশ, তত্ত্বের সন্দেশের শেপ সব।
যা ভেবেছিলাম সেটা কিন্তু ঘটল না। পিঙ্কুর বিয়ের দুদিন পর জয়েন করল পারমিতাদি। একদম কথা কম। মাথা নিচু করে অফিসে আসে। পিঙ্কুর কোন কথা তো বলেই না উল্টে কিছু বললে এড়িয়ে যায়। শিবাজীদা ক্যান্টিনে ধোঁয়া টানতে টানতে বলল,"ওরে এসব হবারই ছিল। চিরজীবন ছেলেছেলে করে গেছে। ছেলে সুন্দরী বউ পেয়ে কি আর মাকে মনে রাখে? এখন দেখ গে যা বউয়ের পা মালিশ করছে।"
শিবাজীদার কথাগুলো শুনতে খারাপ হলেও বাস্তব। আমাদের পাঁচতলা অফিসের ছাদে ক্যান্টিনটা। তাতে সিগারেটের ধোঁয়ায় বৃষ্টি ধোয়া কলকাতা দেখতে দেখতে শিবাজীদার কথায় আমার মনও সায় দিল। সত্যিই তো। আমি সাতবছর হল এখানে ঢুকেছি। তাতে যা জানতে পেরেছি পারমিতাদি স্বামী মারা যাবার পর দ্বিতীয়বার বিয়ে না করে চাকরি করে ছেলের পিছনে পুরো জীবন দিয়েছে। ছেলে যেদিন চাকরি পায় গোটা অফিসে শহরের সবচেয়ে বড় রেস্তোরা থেকে দোকানের বিরিয়ানির প্যাকেট বিলি করেছিল পারমিতাদি। পারমিতাদির গোটা দুনিয়াটাই তো পিঙ্কু।
বাড়ি যাবার পথে পারমিতাদিকে ধরি। লঘু স্বরে বলি," কি ব্যাপার গো? পিঙ্কুর বিয়ের পর তো কোন খবর পেলাম না!" পারমিতাদির চোখ ভরে জল এল। বলল," শ্যামল তোকে আর কি লুকাব বল, পিঙ্কু বউভাতের পরদিন বউকে নিয়ে ঢাকা চলে গেছে। আমাকে কিছুই বলেনি। মন বড্ড খারাপ ভাই। তুই কাউকে কিছু বলিস না"। আমি চমকালাম। বললাম, "এত জায়গা থাকতে ঢাকা! আজকাল লোকে হনিমুন করতে মরিশাস, মালয়েশিয়া, বালি, সিঙ্গাপুর যাচ্ছে। তোমার ছেলে ঢাকা গেল কি করতে?"
পারমিতাদি কাঁদো কাঁদো স্বরেই বলল," তুহিনার ঠাকুরদা এখনও ওদেশে থাকে। তাই আশীর্বাদ নিতে গেছে। অথচ আমাকে এ ব্যাপারে পিঙ্কু আগে কিছুই বলেনি। বাসরঘরে নাকি তুহিনা ওকে বলেছে, সে শুনে ঢাকা যাবার ডিশিসান নেয়। আমাকে বলল যাবার দিন। এত ক্যাজুয়ালি যে আমার মনে হল পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে।"
আমি আর কি বলব। দু একটা সান্তনার কথা বলে চুপচাপ সরে পড়লাম। যা বোঝার বুঝে গিয়েছি। ছেলে কচি বউ পেয়ে মাকে ভুলেছে। আমাদের অফিসের ক্যান্টিন আড্ডাও পানসে হয়ে গেছে। পারমিতাদির পিঙ্কুর চর্চাই আমাদের আড্ডার মূল বিষয় হয়ে গেছিল। সেটা বন্ধ হওয়ায় আমাদের খুশি হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু কেন জানিনা ঠিক খুশি হতে পারছিলাম না।
বাড়িতে বউকেও ঘটনাটা বললাম। ও অফিসে না গিয়েও আমার মুখে মুখে অফিসের কথা শুনে শুনে মুখস্ত করে ফেলেছে। মুখ ঝামটা মেরে বলল, " তোমার কি? তোমার সমস্যা তো কমল। লোককে সুখে থাকতে

দেখলে তো তোমাদের ভূতে কিলায়”। কি আর করি, মানতেই হল কথাটা।
তবু শেষ হয়েও হইল না শেষ। সেদিন অফিসে গিয়েই দেখলাম পারমিতাদি একটা নতুন শাড়ি পড়ে অফিসে হাজির। বুঝলাম পিঙ্কু সংবাদ এসে গেছে। পারমিতাদি আমাকে দেখেই ঝাপিয়ে এল আগের মত,” এই দেখ শ্যামল, পিঙ্কু বাংলাদেশ থেকে এই শাড়িটা এনে দিয়েছে। ঢাকাই জামদানী। সাড়ে বারো হাজার টাকা তুহিনা নিজে পছন্দ করে কিনেছে। ওর মার জন্য একটা। আমার জন্য একটা।“ আমি হাসব না কাঁদব বুঝতে পারছিলাম না। একটু শ্লেষের সাথেই বললাম,” তবে আর কি? শাড়ি পেয়ে গেছ।ছেলেও ফিরে এসেছে। তোমার তো পোয়াবারো পারমিতাদি”।
পারমিতাদি হাসতে হাসতেই কেঁদে ফেলল, চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, “ পিঙ্কু সামনের মাস থেকে কানাডায় ট্রান্সফার নিয়েছে। তুহিনাকে নিয়ে যাচ্ছে। এটাও ছেলে নিজে বলেনি। বউকে দিয়ে বলিয়েছে।“
আমার চোখের সামনে দিয়ে ফ্ল্যাশব্যাকের মত বিয়ের দিনটা ভেসে উঠছিল। তার সাথে পারমিতাদির পিঙ্কু, স্কলার ছেলে, পে স্কেলের এরিয়ারের টাকা দিয়ে ছেলেকে কম্পিউটার কিনে দেবার গল্প - সব। পারমিতাদির শাড়িটা যেন পারমিতাদিকেই ব্যঙ্গ করছিল।
ঢাকাই জামদানী। কি সহজে সবকিছু ভুলিয়ে দিল!

নিশীথিনীর রসিকতা

সনাতন নামটা আজকালকার দিনে যেমন পুরনো পুরনো লাগে, সনাতন আসলে কিন্তু সেরকম নয়। বরং একটু আধুনিকই বলা যেতে পারে। মানে দাঁড়িপাল্লায় ফেললে হয়ত আধুনিক সনাতনের দিকটা একটু বেশিই মাটির দিকে যাবে। সে ফেসবুক করে, ইউ টিউবে উত্তেজক দৃশ্য দেখে আবার বউকে নিয়ে শপিং মলেও বেড়াতে যায়। ক্রেডিট কার্ডে জিনিসপত্র কেনে। নেগেটিভ পয়েন্ট বলতে সে মাঝেসাঝে শনিবারে বড় ঠাকুরের মন্দিরের সামনে গিয়ে নমো নমো করে। বছরে দুয়েকদিন উপোস করে। এটাকে প্রাচীন বলা নাও যেতে পারে।

তার বউ পুজো আচ্চা করে। বরং সে একটু প্রাচীনপন্থী। তার নাম সহেলি। সহেলি ফেসবুক কি বস্তু জানে না। শুধু কখনো সখনো বরকে মোবাইল ঘাটতে দেখলে একটু বিরক্ত হয়। ঠিক যেই সময়টা হয়ত সে চাইছে সনাতন পিছন থেকে এসে তার শরীরের বিভিন্ন অংশে আগুন টাগুন লাগাক তখনই দেখা যায় সনাতন গম্ভীর হয়ে মোবাইল ঘাঁটছে।

বিরক্ত হয়ে বলে, "কি করছ?"

সনাতন গম্ভীর হয়ে বলে "অফিসের কাজ"।

সহেলি অবাক হয়, "অফিসের কাজও আজকাল মোবাইলে হয়?"

সনাতন ততোধিক গম্ভীর হয়ে বলে "হ্যাঁ, এখন টেকনোলজি উন্নত, আমাদের বেশির ভাগ কাজই মোবাইলে করা যায়"।

সহেলি চাপ খেয়ে আর বেশি ঘাটায় না। সে নিজেও একটু শিটিয়ে থাকে। সনাতন অনেক কিছু জানে। তার তুলনায় সে নিতান্তই ইলেভেন ব্যাক।

ওদিকে সনাতন হয়ত গড়িয়াহাটার তমালিকার সাথে গভীর আলোচনায় মগ্ন। তমালিকা বাসন্তী দেবী কলেজে ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী। ইংরেজি অনার্স। সনাতন কেন এখনও বিয়ে করেনি এই বিষয়েই তাদের আলোচনা চলে।

ওদিকে সহেলি সনাতনকে খাইয়ে ঘুমিয়ে পড়ে আর প্রতিরাতে সনাতন গম্ভীর হয়ে ফেসবুক করে যায়।

#

চলছিল এভাবেই মসৃণভাবে। কিন্তু সিনেমা আর গল্প যদি মসৃণভাবে চলে, তাহলে গল্পকার গল্প লেখে কেন আর পাঠকই বা পড়বে কেন? বাংলা সিরিয়ালের মত বেশ একটা গোদা বাঁক এল সনাতনের জীবনে। কিন্তু সেটা জানতে তার বেশ দেরী হয়ে গেল।

ঘটনা হল সহেলি বাপের বাড়ি যেতে তার এক বন্ধু তানিয়া তাকে চমকে দিয়ে বলল "হ্যাঁ রে, সনাতনদা কি ফেসবুকে আছে?"

সহেলি ফেসবুক খায় না মাথায় দেয় না বুঝে তানিয়ার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। অগত্যা তানিয়া পূর্ণ দায়িত্ব সহকারে তাকে ফেসবুকের এ বি সি ডি শিখিয়ে দিল।

এবং

হ্যাঁ এবং-টি হল সহেলি সনাতনের একটি পুরনো স্মার্টফোন ব্যবহার করত। তানিয়া তাকে ওটা থেকেই সব শিখিয়ে দিল। কিন্তু সহেলি ইলেভেন ফেল হলে কি হবে, বুদ্ধিতে আর সব মেয়েদের মতোই তুখোড়। সে ফেসবুকে নিজের নাম নিল নিশীথিনী। তার সাথে একটি কালো বাঁশঝাড়ের(মানে অন্ধকারে তোলা বাঁশঝাড়ের) ছবি।

#
ফেসবুকে সনাতনকে আবিস্কার করা গেল সহজেই। একটা সানগ্লাস পড়া ফটো, রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস সিঙ্গল, এবং একটু উঁকি দিতেই ফ্রেন্ডলিস্টে প্রচুর মেয়ের ছবি পাওয়া গেল। সহেলি আগেই সনাতনকে তার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাল না। সনাতনের ফ্রেন্ডলিস্টের মেয়েদের একের পর এক রিকোয়েস্ট পাঠাতে থাকল।
ইতিমধ্যে মেয়ে ফেসবুকে একা দেখে প্রচুর ছেলের ঝাক ঝাকের কইয়ের মত সহেলিকে যোগ করা শুরু করল। সহেলিও বেশি চাপ ফাপ না নিয়ে সবাইকে কনফার্ম করে নিল। কেউ চ্যাটে এসে জিজ্ঞেস করে যায় “হাই সুইটি কি খবর?” কেউ বা “হায় বেব, অয়াটস আপ?” ইত্যাদি ইত্যাদি। সহেলিও সাধ্যমত জবাব দেয়।
তার মেয়েবন্ধুদের সুন্দর ছবিতে নিশীথিনীকে কমেন্ট করতে দেখে সনাতনও খুব শিগগিরি সহেলিকে অ্যাড করে নিল।
এই ঘটনাগুলি সবই ঘটল দুপুরবেলা। রাত্তির বেলা নিশীথিনী অনলাইন থাকে না। সে তখন শান্ত মেয়ের মত রোজকার রুটিন ফলো করে যায়। তবে সামান্য চেঞ্জ। মাঝরাত অবধি সনাতন ফেসবুক করে যায়। আগে সহেলি শুয়ে পড়ত। এখন ঘাপটি মেরে থাকে।
#
নিশীথিনীঃ তুমি এখনও বিয়ে করনি কেন?
সনাতনঃসেরকম মেয়ে পেলাম আর কোথায়? লাইফ ইজ টোটাল ডাল হিয়ার।
নিশীথিনীঃ কিরকম মেয়ে পছন্দ তোমার?
সনাতনঃ এই ধর তোমার মত, রহস্যময়ী... নিজের ছবি দাও না দেখি একটু সোনাকে।
নিশীথিনীঃ দেব দেব, সময় হলে ঠিকই দেব।
সনাতনঃ আমার খুব দেখতে ইচ্ছা করে তোমাকে। তুমি নিশ্চয়ই খুব সেক্সি হবে। আচ্ছা তোমার হাইট কত?
নিশীথিনীঃ হুম, ওই পাঁচ ফুট ছয় টয় হবে।
সনাতনঃ ওয়াও। দারুণ হাইট তো। তোমার ব্রার সাইজ কত?
নিশীথিনীঃ অসভ্য।
সনাতনঃ এই বল না, প্লিস।
নিশীথিনীঃ জানি না যাও।
সনাতনঃ আরে বলই না, কি হবে, আমি আর তুমিই তো চ্যাট করছি, সবার সামনে বলছি না। আচ্ছা তুমি কখনো সেক্স করেছ? তুমি মাস্টারবেট কর?
আরে কোথায় গেলে? অফ হয়ে গেলে কেন? এহ...
#
এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত।
এইভাবেই একদিন কথা বলতে বলতে গোলপার্কের কাছের একটি রেস্টুরেন্টে নিশীথিনীকে যেতে বলল সনাতন। নিশীথিনী এক রহস্যময় নারী। তার সাথে দেখা করার জন্য উত্তেজনায় ফুটছিল সে।
বাড়িতে সহেলিকে বলে গেছিল সনাতন তার ফিরতে দেরী হবে। অফিসে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং আছে ইত্যাদি ইত্যাদি।
সনাতন বেরোতে বাড়ির কাজ টাজ সেরে দুপুরের পর সাজতে বসল সহেলি। খুব সাজল। দেখতে সে অসামান্যা সুন্দরী না হলেও বেশ চটক আছে একটা তার মধ্যে। সেজে টেজে সে দেরী করল পৌছতে।
রেস্টুরেন্টে পৌঁছে সনাতন আর সে মুখোমুখি হল।
#

তারপর অনেককিছুই হতে পারে, তার দায়িত্ব আমি নিলাম না। পাঠক, আপনি চিন্তা করে নিন, আপনি যা ভাববেন সেটাই ঠিক।

Scoundrel

বড়াল ছেলেটা আমার জুনিয়র। একটু ভিতু ভিতু।
প্রথমে ভাবতাম ছেলেটা বুঝি মুখচোরা। পরে জানলাম তা বটে কিন্তু মদের ঠেকে বসলে দু তিন পেগ পরে বাচাল হয়ে যায়।
আমার পরে জয়েন করলেও বিয়ে আগেই করে এসছে। বিবাহিত ছেলে। কিন্তু হাবে ভাবে সেটা বোঝা যায় না। বিয়েবাড়ি গেলে আমাদের থেকে ওর দেখি মেয়েদের প্রতি ছুকছুকানি বেশি। পারলে যেন চোখ দিয়ে গেলে।
অবশ্য ওর বউকে দেখে বোঝা যায় সেটার কারণ। একটা থলথলে টাইপ চেহারা। যদিও থলথলে চেহারার বউ থাকলেই যে রোগা বরেরা অন্য মেয়েকে ছক করার লাইসেন্স পেয়ে যায় এরকম কোন ব্যাপার নেই।
এর মধ্যেই উৎপলের বিয়ে গেল। উৎপল আমাদের ব্যাচের ছেলে। বিয়ে করব করব ভাব ছিল। করল কিছুদিন পর। একটা টাটা সুমো ভাড়া করে আমরা সব ব্যাচেলার ছেলেগুলি গেলাম ওর বিয়েতে। বড়াল বলল ওর বউ নেই, ও আমাদের সাথে যাবে। আমরা বেশি আপত্তি করলাম না, গাড়ি ভাড়া যত বেশি লোক হবে আমাদের তত কম টাকা দিতে হবে। গাড়ির পেছনে আমি আর বড়াল বসলাম। গাড়ি চলতেই একটা হুইস্কির বোতল খোলা হল। খোলা জানলা দিয়ে হু হু করে বাতাস আসছে আর আমি বড়াল ঢুক ঢুক শুরু করেছি।
দুটো পেগ পরেই ব্যাটার নেশা উঠে গেল। আমায় বলল "শান্তনুদা, আমার জীবনটা শেষ হয়ে গেল"।
আমিও নেশার ঘোরে। মাথা টলটলায়মান। ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম, "হ্যাঁ ভাই আমারও"।
বড়াল আমায় ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, " কী যে বল। তোমার? তুমি শালা কপালওয়ালা ছেলে। এখনও বিয়ে করনি। তোমার চিন্তা কি?"
আমি বুঝলাম ছেলেটার ফ্রাস্ট্রু আছে। বললাম "কেসটা কি বল?"
নেশার ঘোরে বড়াল যা বলল তা শুনে আমার নেশা নেমে গেল। ও নাকি বিয়ের পরে জানতে পেরেছে ওর বউয়ের আগে একটা পেট ক্লিয়ার হয়েছে। পেট ক্লিয়ার মানে অ্যাবরশান।
কি বলব আমি! সান্তনা জানানোর কোন ভাষা নেই। তার উপরে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা এসে লাগছে আমার চোখে নাকে মুখে। নেশাটা একবার ধরছে একবার ছাড়ছে বড়ালের কথা শুনে। কি বলব কি বলব চিন্তা করতে করতে শেষে বললাম "তাহলে একটা এখন আর তো কিছু করার নেই।মেনে নে, আর কি করবি?"
একটা খিস্তি দিয়ে বড়াল বলল "মেনে নেব কি বলছ? আমি ছাড়াছাড়িতে নেই। আমিও অ্যাফেয়ার করব"।
শুনে বুঝলাম চড়েছে বেশ। নেশা হলে তখন আর আমার মাথা কাজ করেনা। আমিও ওকে উৎসাহ দিলাম, কর কর। চাপ কিসের ইত্যাদি ইত্যাদি।
পরেরদিন অফিসে দেখলাম বড়াল আমায় একটু এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে। আমি বুঝলাম ব্যাটা কালকে সব বলে কেস খেয়ে গেছে।
আমিও আর বেশি ঘাঁটালাম না। কাজে মন দিলাম।
এর প্রায় এক মাস বাদে বড়াল আমার কাছে এল। ভীত সন্ত্রস্ত মুখ। বলল "শান্তনুদা তোমার কোয়াটারে দুদিন থাকতে দেবে"?
আমি থাকি একা। চিন্তা ভাবনা নেই। বললাম "দেব কেন তোর বউ নেই?"
বড়াল বলল "না, ও বাপের বাড়ি গেছে"।

বুঝলাম না সমস্যাটা কি। চিন্তা করে দেখলাম ভালই হল, সন্ধ্যেগুলি প্রেমিকার সাথে ফোনে আর ফেসবুক করে ঠিক জমছে না, বড়ালের সাথে একটু আধটু ঢুক ঢুক করা যাবে আর ওর ক্রিটিকাল কেস কি সব আছে সেগুলিও জানা যাবে।
রাত্তিরে বড়াল আমার কোয়াটারে এসে বলল "শান্তনুদা, মহা কেস খেয়ে গেছি"।
আমি বললাম "কেন রে? কি কেস?"
বড়াল কাচুমাচু মুখে আরও একটা যা তা গল্প শুনিয়ে দিল। ও নাকি বউয়ের উপর খচে টচে কোন এক মেয়ের নম্বর যোগার করে তার সঙ্গে চুটিয়ে দুদিন ফোন করে, একদিন দেখা করে। কচি মেয়ে, ক্লাস টেনে পড়ে। সিনেমাহলের অন্ধকারে হাত ধরাধরি অবধি করে হঠাৎ ওর খেয়াল হয় ও যা করছে তা ঠিক নয়। টয়লেটে যাবার নাম করে ওখানেই মেয়েটাকে রেখে চলে আসে। মেয়েটা ওকে ফোনে বারবার ট্রাই করে। ও ফোন ধরেনি। কাল রাতে মেয়েটার দিদি অন্য এক নাম্বার থেকে ওকে ফোন করে জানিয়েছে মেয়েটা ঘুমের ওষুধ খেয়েছে। এখন ওর নামে থানায় কেস করা হয়েছে।
সারারাত বড়ালকে ফোন করা হয়েছে আননোন সব নম্বর থেকে। ঘুম টুম মাথায় উঠেছে। বলা হয়েছে আজ নাকি পুলিশ আসবে ওকে ধরতে।
আমি মনে মনে বললাম "খাইসে"। মুখে বললাম, "ঠিক আছে, চাপ না নিয়ে ঘুমা দেখা যাবে"।
সে রাতটা, আরও দুরাত বড়াল আমার কোয়াটারেই ঘুমাল। আমারও একটু ভয় ভয় হচ্ছিল ওকে আশ্রয় দিয়ে তবু কলিগ বলে কথা। মনে মনে অবশ্য দু পাঁচবার ওকে স্কাউন্ড্রেল বলে ফেলেছি। নিজের বউয়ের উপর রাগ করে অন্যের জীবন নষ্ট করার কোন মানে হয় না।
ওকে একবার বললাম বসকে সব জানিয়ে রাখতে। বারণ করল। কারণ তাহলে অফিসে জানাজানি হয়ে যাবে, প্রেস্টিজের ব্যাপার ইত্যাদি।
তিনদিন পরে ওর বউ ফিরল বাপের বাড়ি থেকে। ওকেও অগত্যা ফিরতে হল নিজের কোয়াটারে। ব্যাপারটা যে খুব ঘেঁটে গেছে সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম তবু আমার ঘাড় থেকে নামল বলে আমিও খানিকটা স্বস্তি পেলাম।
এক সপ্তাহ পর বড়াল আমায় নেমন্তন্ন করল। অবশ্যই মদ খাবার। শুনে বুঝলাম ঝামেলা মিটেছে হয়ত।
সুসজ্জিত বারে তন্দুরি চিকেন, বিফ স্টেক আর স্কচ অর্ডার করে বেয়ারা যখন সব জিনিসপত্র টেবিলে সাজাচ্ছে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কি রে এত খাওয়াচ্ছিস যে? সব মিটল নাকি?"
বড়াল বিরাট একটা হাসি দিয়ে বলল "মিটল মানে ভালভাবেই। বউকে সব বললাম। বউ ওর এক উকিল দাদাকে দিয়ে কোর্টে একটা কেস করিয়ে দিয়েছে মেয়েটা আর মেয়েটার দিদির নামে। এই ভাবে কেস করানো হল যে মেয়েটা আমার সাথে দেখা করে জোর করে আমায় বিয়ে করার জন্য ব্ল্যাকমেল করে এবং আমার থেকে কিছু টাকা নেয়। এখন ঘুমের ওষুধের নাটক করে আরও টাকা চাওয়ার ধান্ধা ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার বউটা খুব ভাল বুঝলে। কি সুন্দর সব কিছু মিটিয়ে দিল। আমি এখন খুব খুশি। ঠিক করে নিয়েছি সারাজীবন বউয়ের সাথে আর কোন ঝামেলা করব না"।
অল্প শোকে কাতর আর অধিক শোকে পাথর বলে একটা কথা হয়। এতদিন কাতর ছিলাম, আজকে একেবারে প্রস্তরীভূত হয়ে গেলাম।
তবে সেটা হবার পূর্বে আর মনে মনে নয়, মুখেই একবার "স্কাউন্ড্রেল" শব্দটা উচ্চারিত হয়ে গেল।

ফাঁকি

।। সোমেশ্বর ।।

ফোনটা আমার সাথেই থাকে। তবু বউ যখন কাছে থাকে তখন ওটা একটু আড়াল রাখি। যখন তখন শাওনি ফোন করে ফেলে বলে ফোনটা একটু লুকিয়ে রাখাই ভাল। শাওনির নম্বরটা আমার মোবাইলে দীপক নামে সেভ করা আছে। দীপক আমার ছোটবেলার বন্ধু। মাঝে মাঝে আমার ফোনটা আমার বউ নিয়ে ঘাটাঘাটি করে। আমায় সন্দেহ করে নাকি জানি না। বলে সুডোকু খেলে। সুডোকু খেলার মধ্যে অত মজার কি আছে জানি না। আমি দুএকবার খেলে দেখেছি, বড় বাজে খেলা। অত নম্বর মাথায় ঢোকে না আমার। কোনাকুনি পাশাপাশি উপর নীচ। এর থেকে শাওনিকে কল্পনা করা সহজ। আসলে শাওনি একটা প্যাকেজ হিসেবে দুর্দান্ত। যাকে বইয়ের ভাষায় বলা চলে 'উত্তম বাঁধাই, চমৎকার প্রচ্ছদ, তারসাথে প্রত্যেকটা পাতা একেবারে দামী কাগজে ছাপা'।

তার তুলনায় আমার বউ তিতির একদম পুরনো নিউজপ্রিন্টে ছাপা বাতের বিজ্ঞাপনের কাগজ। যাও বা ঠিক ছিল, মেয়ে হবার পর আরও মুটিয়ে গিয়ে আমার জীবনটাকে পাতিলেবু করে দিয়েছে। যখনই ইচ্ছা করে কোনদিন বলে আজ মাথা ব্যথা করছে, কোনদিন ওর কোমরে দারুণ যন্ত্রণা। ভাগ্যিস শাওনি ছিল। মাঝে মাঝেই অফিসে কাজের নাম করে শাওনিকে নিয়ে চলে যাই ভাল একটা হোটেলে। একটা রুমে জমিয়ে খাওয়া দাওয়া আর বাকি কাজ কম্মো হয়। আজকাল শাওনি প্রোমোশান নিয়ে বড্ড জ্বালাতন করে। কি করে যে ওকে বোঝাই ওরে অফিসে বসের সাথে হপ্তায় দুবার শুলে প্রোমোশান হয় না। তা কে শোনে কার কথা। আগের দিন এই নিয়ে ভাল ঝামেলাও হয়ে গেছে। দিব্যি চিকেন তন্দুরি আর দুটো লার্জ হুইস্কি অর্ডার দিয়ে অ্যাটেম্পট নিচ্ছি শাওনির কোমরটার, দুম করে বলে বসল, 'শর্বাণী কেন এই মাসে একটা ইনক্রিমেন্ট বেশি পেল?' কি আর বলব সেদিনটা বড্ড খারাপ গেল। শেষ মেষ প্রতিশ্রুতি দিতে হল হেড অফিসে ওর জন্য একটা স্পেশাল ইনক্রিমেন্ট দাবী করব ইত্যাদি ইত্যাদি।

আসলে অফিস এলে আবার শাওনির ব্যাপারটা ঠিক মনে থাকে না। একে কাজের মারাত্মক চাপ থাকে তার ওপর শাওনির কাজ কর্ম অনেকেই পছন্দ করে না। ওর আসা যাওয়ার কোন ঠিকও নেই। এখনই ওকে আলাদা সুবিধা দিলে সমস্যা ভালই দেখা দেবে। তাই আপাতত ডিফেন্সিভ খেলছি। সুযোগ বুঝে শাওনির ইনক্রিমেন্টের ব্যবস্থা করা যাবে।

বাড়িতে আমার বিয়ের ফটো এখনও বসার ঘরে জ্বলজ্বল করে। কি ছিল তিতির আর কি হল। আমার বসার ঘরে বন্ধু বান্ধবের ভিড় লেগে থাকত। সূর্য তো রীতিমত চাপ নিয়ে বসে থাকত। আমি সবই বুঝতাম। বেশ উপভোগ্য ছিল সেসব দিন।

আর এখন সোনা হবার পর তিতিরের চেহারা দেখলে কান্না পায়। এই মুটকি হোঁৎকা টাইপ। ভানুর কথা মনে পড়ে, 'একলগে রিক্সায় চাপতে গেলে রিকশাআলা পর্যন্ত কয়, বাবু, আপনি মাঈজীর কোলে বসেন'।

সেক্সের ব্যাপারে আমি আজন্ম ভিখারি। ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় টিউশনি পড়াতে আসত সুলগ্না ম্যাডাম। ঢেউ খেলানো চেহারা, তার সাথে সমুদ্রের মত গভীর চোখ। পড়তে গিয়ে প্রায়ই ম্যাডামের গুরুত্বপূর্ণ বস্তু সমূহের প্রতি নজর চলে যেত। ম্যাডাম বুঝত সবই। একদিন বাড়িতে কেউ ছিল না। পড়াতে বসে হঠাৎ বলে, 'এই তুই কি চাস রে? রোজ রোজ আমার বুকের দিকে তাকিয়ে থাকিস কেন?' আমি ভাবি নি এরকম প্রশ্ন শুনতে পাব। বলে ফেললাম 'ভাল লাগে বলে'।

ম্যাডাম কিছুক্ষণ তাকিয়ে নরম গলায় বলেছিল, 'বড় হোস এরকম অনেক ভাল লাগা পাবি'।

সেদিন আর বেশি পড়া হয় নি। ম্যাডাম তারপর দিন থেকে আর আসতও না।
ওই ম্যাডাম, একটা পাড়ার দিদি, মাসতুতো বোন ইত্যাদিকে নিয়ে ভাবনায় প্রচুর সময় কাটিয়েছি। কিন্তু সমস্যাটা হল বিয়ের আগে অবধি দুর্ভাগ্যবশত আমি একজন পবিত্র ভার্জিন ছিলাম। সম্বন্ধ করে বিয়ে হবার পর ফুলসজ্জায় তিতিরকে দেখে মনে হয়েছিল এই আস্ত একটা মেয়েমানুষ গোটাটাই আমার। কী সব দিন ছিল।
আর বিয়ের চার বছর পর যে তিতির এরকম একটা আগ মার্কা পানসে তেতুল বেরোবে কে জানত। সোনা হবার আগে থেকেই অবশ্য শাওনিকে ফিট করি। এখন ব্যাপারটা বেশ থার্ড গিয়ারে চলছে। চলছেই যখন চলুক জমিয়ে।
শাওনির দরকার প্রোমোশান, ইনক্রিমেন্ট আর আমার দরকার শাওনির নরম শরীর। দরকারটা এভাবেই মিটুক না! ক্ষতি কি!

।।শাওনি।।
একটা লম্বা ছুটি নিতে হবে। সোমকে বলাটাই চাপ লাগে। ব্যাটা সেক্স স্টারভড গাম্বাট। নিজের বউ প্লেজার দিতে পারে না বলে আমাকে ইউজ করে। আর আমাকে কি ভাবে কে জানে। কিছুই বুঝিনা না কী! অ্যাকাউন্টসের শর্বাণীদি আগের মাসে একটা স্পেশাল ইনক্রিমেন্ট পেল। তাপসী দাস একটা প্রোমোশান পেল। আর তার তুলনায় তোর সাথে শুয়ে আমি কি পেলাম? কাঠপেন্সিল!
পিয়াল অনেকদিন ধরেই বলছিল ওর অফিসে ছুটি আছে। মার্চ নাগাদ কাশ্মীর যাবে। আমিও যেতে চাইছি ওর সাথে। সোমের সাথে সারাজীবন শুলে তো আমার চলবে না, আমারও লাইফ আছে। হু দ্য হেল ইজ সোম যে ও সেটাকে স্পয়েল করবে! দু বছরের মধ্যে বিয়ে করছি। যদি তখন দেখি ওর সাথে শুয়ে আমার লাভ হচ্ছে দেন ওকে। নইলে আই হ্যাভ টু থিঙ্ক টোয়াইস।
পিয়ালের সাথে সম্পর্কটা রাখতেই হবে।পিয়ালের ব্রাইট কেরিয়ার। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে বড় পোস্ট। আর তিন চার বছরের মধ্যে ও স্টেটসে শিফট করবে।আঠার মত লেগে থাকতে হবে তাই ওর সাথে। মাঝে মাঝেই বিয়ের জন্য ঘ্যান ঘ্যান করে যখন আমিও একটু আধটু কোমল নি, শুদ্ধ পা ইত্যাদি ওর হারমোনিয়ামে বাজিয়ে দেখে নি ব্যাটা ঠিক বলছে নাকি। এখন অবধি তো ঠিকই বাজছে। কেলো অবশ্য হয়েছিল একবার। কিড স্ট্রিটের এক হোটেলে একরাতে আটটা নাগাদ আমি আর সোম বেরিয়ে সোমের গাড়িতে উঠতে গিয়ে দেখি পিয়াল একটা বাস থেকে আমায় দেখতে দেখতে যাচ্ছে। তার আগে ওকে ফোনে বলেছিলাম অফিসে একটা মিটিং আছে। আমায় দেখে তখনই মোবাইলে ফোন।
একটা ইম্পরট্যান্ট সেমিনারে এসছিলাম এইসব বলে ছাড় পেলেও বেশ কটা দিন সন্দেহের চোখে দেখত। আলগা টাইমে ফোন করত। আমি তখন কয়েকটা দিন সোমের সাথে বেরোতাম না। একটু অ্যাভয়েড করতাম সোমকে। কারণ সোম আমার ফাটকা বাজির শেয়ার মার্কেট হলে পিয়াল হল গোটা জীবনের মোটা অঙ্কের ফিক্সড ডিপোসিট। ওকে হাতছাড়া করলে বেশ কিছুদিন লেগে যাবে আরও কাউকে যোগার করতে।
সম্পূর্ণা, জিনিয়ারা প্রায়ই আমার সাথে সোমের মাখোমাখো ভাব নিয়ে অনেক কিছু বোঝাতে চায়। আমি অতটা গায়ে মাখি না। সোমের বস নায়ার যখন কলকাতায় এসছিল তখন দুরাত হোটেলের ঘরে কারা যেত সে সব আমার ভালই জানা আছে। সোম আমায় আড়াল করেছিল বলে যেতে হয় নি। বেশি বলতে এলে ফোঁস করে দি। তখন আবার কিছু দিন চুপ থাকে। আমার তো ভাবতেই ঘেন্না লাগে। মাগো। ওই বুড়োটার সাথে কি করে এক বিছানায় ছ্যা ছ্যা! সোম সেদিক থেকে অনেক ভাল। ইভন পিয়ালের থেকেও। শুনেছি ওর মুটকি বউ নাকি ওর সাথে শুতে চায় না। মদের ঘোরে আমার বুকের উপর পড়ে অনেক সময়েই একটু একটু করে কাঁদে আর ওসব উগড়ে দেয়। আমার ওই সময়টা তাড়া থাকে বাড়ি ফেরার। কোনমতে তুলে

মুখে জল টল দিয়ে রেডি করতে করতে বেরিয়ে পড়তে হয়। ওই অবস্থাতেই সোম চেঁচিয়ে যায়, 'হেল হেল, ওয়াট আ হেল ইজ মাহ লাইফ! ও তিতির, দেখো, শাওনিকে পেয়েছি আমি। আমার ডেস্টিনেশান শাওনি।' ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সময়টা রোজ বড় অস্বস্তি লাগে আমার। কেন জানি না।

।। তিতির ।।

সোনার দুবছর হবে আসছে ফেব্রুয়ারিতে। আমাদের বিয়ের দুবছরের মাথায় সোনা আসে। আমি যখন কনসিভ করি, খবরটা প্রথম কাকে জানাব ভাবতে হয়েছিল। কে জানলে বেশি খুশি হবে? সোম না সুকুমার? সুকুমার জানলে খুশি হত কি? বাপের বাড়ি গেলে সুকুমারের ঘরে না গেলে আমার শান্তি হত না। মনে আছে সোম অফিস যাবার পথে আমায় নামিয়ে দিয়ে যেতেই এক অদ্ভুত আকর্ষণে আমার পা দুটো যেন চলে যেত সুকুমারের বাড়ি। ওদের বাড়িতে ছোটবেলা থেকেই আমার অবাধ যাতায়াত। তেতলার ছাদে ছোটবেলা থেকেই কত রোদ পুহিয়েছি, এক্কা দোক্কা খেলেছি বাসবীদির সাথে। আমার আর বাসবীদির বিয়ে এক মাসের ব্যবধানে হল। সুকুমার তখন বেকার। আমি দুর্বল গলায় একবার ওকে বলেছিলাম চ' আমরা পালিয়ে যাই। আমরা দুজনেই জানতাম সে সব সম্ভব না। বিয়ের পর সুকুমার তাকাত অবাক চোখে। আমার মাথায় সিঁদুর। হাতে শাখা পলা। সোম এক সফল চাকুরে। হাতে দামী ঘড়ি। শশুর বাড়ি এসেও ল্যাপটপ খুলে বসছে। জামাই দেখতে এসে সুকুমাররা দেখত জামাই শশুরবাড়ি বসে 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' করে চলেছে। সুকুমারের হতাশ চাউনি আমাকেও বিঁধত।

আপাদমস্তক শহুরে সফল প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখে সুকুমার বেশ কিছুদিন মিইয়ে থাকত। আমি আসলে থাকত না বাড়ি। কোথায় কোথায় চলে যেত। আমি ওর ঘর পরিষ্কার করে দিয়ে আসতাম চুপি চুপি। ওর ঘরে ছেলেবেলার একটা খেলনা স্টেনগান এখনও ঝোলানো। আমায় দেখে যেটা নিয়ে তাড়া করত। ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট পেরেক থেকে ঝুলছে। পরম মমতায় আমি বিছানা বালিশ পরিষ্কার করে যেতাম। দু বছর আগে এক দোলের বিকেলেও এসছিলাম।

বাড়ি নেই শুনে চলে আসছিলাম। কি মনে হল, মশারিটা তখনও ঝুলছে দেখে থাকতে পারলাম না। দ্রুত সেটাকে গোছাতে যেতেই সুকুমারের প্রবেশ। সেদিন যে কি কি হয়েছিল আমার আর মনে নেই। এটুকু মনে আছে খালি আমার ঠোঁটে চুমু খেতে খেতে বার বার বলেছিল রুমকি তুই আমার। তুই আর কারও হতে পারিস না।

সেদিনের পর বিহ্বল হয়ে গেছিলাম। ওরাল কন্ট্রাসেপ্টিভ পর্যন্ত খাওয়া ভুলে গেছিলাম। টের পেলাম দুদিন পরে।

তারপর থেকে সোমকে আমি আর নিতে পারতাম না শরীরে। কাকে জানাতাম তখন? ঠিক করতে পারিনি। এক আধদিন রাত্রিবেলা সোম মদে চুর হয়ে এলে আমায় জড়িয়ে ধরে যখন বলে "শাওনি তোমায় ছাড়া আমি বাঁচব না, তুমি তিতির হয়ে যেও না প্লিজ'', সেদিন অপরাধবোধগুলি কিছুটা কমে হয়ত। কমে ওই পর্যন্তই।

কতটা কমে জানা নেই...

একটি দুর্ঘটনার গল্প

১।
অসীমের স্কুটারটা বেরিয়ে গেলে সুমিতা রান্না বসাল।এই সময়টা তার ব্যস্ততা তুঙ্গে থাকে। কদিন ধরে তুতানটার পেট ঠিক নেই। যত দামই হোক শিঙি মাছের ঝোল খাওয়াতে হবে। বাড়িওয়ালা বুড়িটা পাম্প নিয়ে খুব জ্বালাতন করে। দশ মিনিটের বেশি পাম্প চললেই উপর থেকে নেমে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। সুমিতা পাম্প চালিয়ে তুতানকে রেডি করে নিল। পুলকারটা আসতে দেরী হচ্ছে। তুতানকে রেডি করতে করতেই বাড়িওয়ালীর চিৎকার, সুমিতা পাম্প বন্ধ কর, টাইম হয়ে গেছে। সুমিতা একবার ঘড়ির দিকে তাকাল। পুরো দশ মিনিটও হয় নি। তবু পরের বাড়ি। সে চেঁচাল হ্যা মাসিমা করছি বন্ধ। তুতানের গাড়ি এসে গেছে। ওকে নিয়ে বেরোতে যেতেই ফোনটা বাজতে শুরু করল। তাড়াহুড়োয় ধরা হল না। তুতানকে গাড়িতে তুলে ফিরতে আবার বাজতে লাগল। সুমিতা বিরক্ত হয়ে ফ্রিজের ওপর থেকে ফোনটা তুলল।
অসীমের ফোন। কি হল আবার। "হ্যালো,বল।"
"হ্যালো আপনি কে বলছেন?"
"হ্যা কে বলছেন"?
"দেখুন আপনার নম্বর এই ফোন থেকে পেলাম। এখানে এই মাত্র একটা অ্যাকসিডেন্ট করেছেন। ওনাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওনার স্কুটার একটা বাসের সাথে ধাক্কা মেরেছে। আপনি পারলে মিশনে চলে আসুন"।
সুমিতার হাত থেকে ফোনটা পড়ে গেল।
২।
-আপনার বিবাহিত জীবন কদিনের?
-পাঁচবছর।
-আপনার স্বামী কোথায় কাজ করতেন?
-সিনপ্লিস কন্সট্র্যাকশানে।
-আপনাদের বাড়ি কি এখানেই?
-না, আমাদের বাড়ি চন্দনপুর।
-কোথায় ওটা?
- বীরভূমের একটা গ্রামে।
-আপনার স্বামীর স্কুটার কত দিনের?
-ওই তিন বছর হল। সেকেন্ড হ্যান্ড কিনেছিল।
-এখন কি করবেন?
-বাড়ি ফিরব। এখানে আর থেকে কি হবে।

বউটা কান্না চাপতে পারল না। সরে এল কৌস্তভ।
এ সব কেস খুব বাজে। সাধে কি আর মিত্রদা তাকে বলে "এখনও নাক টিপতে দুধ বেরোয় আর এসছিস পুলিশের চাকরি করতে।" কে আর মিত্রদাকে বোঝাবে কে চেয়েছিল পুলিশে চাকরি করতে। বিএসসি করে বেকার হয়ে বসেছিল এক বছর। ভাগ্যিস বেরিয়েছিল ওপেনিংটা। ট্রেনিং ফেনিং সেরে এই গঙ্গাপুরে

পোস্টিং। মা বাবা সব গর্ব করে বলছে ছেলে পুলিশ হয়েছে। আর তার কিছুই ভাল লাগছে না। দিনভর চোর ডাকাত এসে ভিড়ছে এই ঝাড়খন্ড বর্ডারের এলাকায়। প্রাইমারিলি তার কাছেই পাঠাচ্ছে সব মিত্রদা। এ যেন এক ধরণের র‍্যাগিং। এক কয়লা মাফিয়াকে ধরল সেদিন। ট্রাকে করে পালাচ্ছিল। মিত্রদা ঘেটি ধরে এনে ঢোকাল হাজতে। তারপর তাকে পাঠানো হল। সেই মাফিয়ার নাম মিন্টু সিং। তাকে দেখে ফিক ফিক করে হাসে। বলে বাবু আপ কো তো কলেজ মে হোনা চাহিয়ে থা। ইধার কা করতে হো।

মিত্রদা এক ধমক দিয়েছিল মিন্টু সিংকে। কিন্তু তারপর থেকে তাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা আরও বেড়ে গিয়েছিল। আজ ডিউটি করছিল চৌমাথার মোড়ে। হেলমেটহীন চালকদের পাকড়াও সহ তাদের গাড়ির কাগজপত্র দেখছিল সে। হঠাৎ চোখের সামনে দেখতে পেল একটা স্কুটার জোরে আসতে আসতে একটা বাসকে ওভারটেক করেই হঠাৎ থেমে গেল। লোকটার অসহায় দৃষ্টি সে আজও ভুলবে না। মুহূর্তের মধ্যে পিছনের বাসটা উড়িয়ে দিল লোকটাকে। চোখের সামনে এই দৃশ্য নিতে পারছিল না কৌস্তভ। হড় হড় করে বমি চলে এল। তার কনস্টেবলরা দৌড়ে গেল লোকটার দিকে। এখনও ভাবলে কেমন একটা গা গুলোচ্ছে। একটু আগেই ডাক্তারবাবু বলে গেলেন অসীম দাস এক্সপায়ার করে গেছেন। মহিলা দিশাহারা ভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। তাকে দেখে একবার বললেন "আমার ছেলেটা স্কুল থেকে ফিরবে"।

কৌস্তভ সে ব্যবস্থা করে দিয়েছে। বাড়িওয়ালার সাথে কথা হয়েছে। তার কাছেই ছেলেটা থাকবে। আপাতত কতগুলি ঝামেলা আছে। পোষ্টমরটেম আছে। মিত্রদা আজ আবার ছুটি নিয়ে কলকাতা গেছে। কি যে সমস্যা। মহিলাকে তার ফোনটা দেওয়া আছে। সব জায়গায় ফোন করছেন উনি।

৩।

-বহুত পুরানা স্কুটার সাব। ইস কা ক্যা করেগা?

কৌস্তভ মানল না। এরা স্কুটার বেঁচে খাওয়ার ধান্দা করছে। আজকাল পাবলিক পুলিশকে ইয়ার দোস্ত ভেবে বসছে। কোথায় একটা এত বড় দুর্ঘটনা হল, স্বাভাবিকভাবেই গাড়িটা থানায় যাবে, এই খোট্টাগুলো ঘ্যান ঘ্যান শুরু করেছে। ও তারাকে ডাকল। তারা ভাল চিৎকার করতে পারে। এসেই এদের উপর চেঁচামেচি শুরু করল। পালাল। ক্রেন এসে থানার দিকে রওনা দিল স্কুটার নিয়ে।

৪।

"কিরে বিয়ে থা করবি না? ভাল চাকরি পেলি, এবার বাবা মার সেবা কর"।

মামা ফোন করলেই কৌস্তভের বিরক্তি লাগে। এত ফালতু বকে। এখন কে বিয়ে করবে! এমনিতেই মৌ এখনও গ্রাজুয়েশন করেনি। ও বলেই দিয়েছে গ্রাজুয়েশন না করে বিয়ে করতে পারবে না। মৌ সবে সেকেন্ড ইয়ার। তার মানে এখন তো কোন প্রশ্নই নেই।রাত দেড়টা দুটো অবধি কথা হয়। পোষ্ট পেড করে নিয়েছে সে মোবাইল। নইলে টাকা থাকেই না। কতবার আর রিচার্জ করবে।সারাদিন যা ঘটে তাই মৌকে না শোনান পর্যন্ত তার শান্তি নেই। মৌও তাই। তার সব কথা মন দিয়ে শোনে। অ্যাকসিডেন্টের ঘটনাটা ওকে পুরো বলতে পারে নি কৌস্তভ। তার নিজেরই ঘুম আসেনি। সুমিতাকে যখন গাড়ি করে নামিয়ে দিতে গেছিল বাড়ির দোতলায় ছোট ছেলেটার উৎকণ্ঠিত মুখ এখনও চোখের সামনে ভাসছে তার। মৌ শুরুটা শুনেই বলল "থাক থাক, আর বোল না। আহারে।"

সুমিতাকে নামিয়ে বাড়িওয়ালার ঘরে কিছুক্ষণ বসেছিল সে। এরা নীচে থাকে একতলায়। সাধারন মধ্যবিত্ত ঘর। বসার ঘরেই টি ভি। পাড়ার কিছু লোক ছিল। সুমিতার তিরিশের মত বয়স। কিছুটা চটক আছে চেহারায়। বাচ্চাটা একমনে খেলে যাচ্ছিল। কৌস্তভ বসেছিল কিছুক্ষন। বাড়িওয়ালাটা একটা হৃদয়হীন পাষণ্ড। এরকম দিনে কেউ বলতে পারে, "আমার ছেলে এন আর আই, বিদেশে থাকে। সামনের মাসে বাড়ি ফিরবে।একটা বিয়ে দিলে শান্তিতে থাকি।" এসব বলল তাও ঠিক আছে, এরপরে বলে বসল "ওই তো অসীমের গাড়িটা খারাপ হয়েছিল মাঝে। আমার ছেলে তখন এদেশে। ওই তো মেকানিক ঠিক করে

দিয়েছিল। খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল।" বিচ্ছিরি লাগছিল তার। একী? সামনে একজন সদ্য স্বামীহারা বসে আছেন তার মধ্যেই এসব চর্বিত চর্বণ এখন না করলেই নয়?

কৌস্তভ কিছু বলেনি আর। এ'কদিনে কম লোক দেখতে হল না তাকে। পুলিশে এসে মনে হচ্ছে জগৎ দর্শন হচ্ছে তার।

তার চেয়ে এই যে রাতে মৌ-র সাথে এই ঘণ্টা দুয়েক কথা তাতে কিছুটা আত্মার শান্তি হয়। মৌ ক'দিন ধরেই বলছে কলকাতায় যেতে। একটু ঘুরবে, একটু শপিং, একটা সিনেমা দেখবে অনেক প্ল্যান করে ফেলেছে মেয়েটা। যেতে হবে। ছুটি চেয়েছে। মিত্রদা এখনও দুদিন ফিরতে। তারও ইচ্ছে করছে অ্যাকসিডেন্টটা দেখার পর কিছুদিন হাওয়া বদলে আসতে। এমনিতেই এই কোলফিল্ড এলাকায় তার একেবারেই মন বসছে না। এখানে অপরাধ এত বেশি যে কখনও বসে থাকা যায় না। মিনিটে মিনিটে ফোন। কোথাও ছিনতাই, কোথাও চুরি লেগেই আছে। এখান থেকে বেরোতে পারলেই শান্তি। আর মৌ কাছে থাকলে আর কিছু ভাল লাগে না। এর আগে একটা সিনেমা হলে মৌয়ের ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে প্রথম চুমুটা খেয়েছিল কৌস্তভ। তারপর থেকে সবসময়েই মনে হয় কখন যাওয়া যাবে মৌয়ের কাছে। ফোনে কথা হতে হতে সে যখন বলে ফেলে "এবার গিয়ে তোমায় কিন্তু ছাড়ব না মৌ, এবার কোন হোটেলে ঘর ভাড়া করলে কেমন হয়?"

মৌ রেগে বলেছে "আমায় সেরকম মেয়ে মনে কর নাকি?" অগত্যা ব্যাক গিয়ার টানতে হয়েছে তাকে। আদতে কৌস্তভের অনেকবারই মনে হয়েছে দু একটা চুমুটুমু না খেয়ে সব কিছু একবারে হয়ে গেলেই হত। কিন্তু প্রতিবারই মানা করেছে মৌ।

মেয়েটাকে ভাল করে বুঝতে পারে না সে। অথচ সেদিন সিনেমা হলে মৌ-ই প্রথম হঠাৎ তার গালে একটা চুমু খায়। কি যে চায় মেয়েটা!

৫।

-কারবুরেটর কা তার কাটা হুয়া হ্যায় সাব।ইস কে লিয়েহি অ্যাক্সিলেটর ফেইল হুয়া থা।

-তো কা করে?

-ইহা পর হি রাখ দিজিয়ে সাব। কাল লেকে যানা।

এ এক সমস্যা হয়েছে তার। রাস্তার মাঝখানে হেলমেটহীন এক চালকের পিছু করতে গিয়ে গাড়িটাই গেল বিগরে। সাধারণত সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কনস্টেবলগুলোই চেক করে গাড়িটা। আজ একটা বাইকে তিনজন যাচ্ছিল। ওরা দাঁড়াতে বলায় শো করে বেরিয়ে গেল বাইকটা। ওটা দেখে রোখ চেপে গেছিল কৌস্তভের। তাড়া করে কিছুটা যেতেই গেল দুম করে থেমে গেল গাড়িটা। একটা বিচ্ছিরি জায়গা এটা।রাস্তা খারাপ। লরি চলছে সারে সারে। তারসাথে এত ধুলো যে দম আটকে আসছে তার। একটু ডাস্ট অ্যালার্জি মত আছে তার। এই ধুলোয় হাঁচির পর হাঁচি শুরু হল তার। মোবাইল বের করে তারাকে ফোনে ডেকে নিল সে।

৬।

ট্রেনটা গঙ্গাপুর ছেড়ে যেতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল কৌস্তভ। এমনিতেই এ জায়গাটা তার বড় বিচ্ছিরি লাগে। তার উপরে এক'দিন একটার পর একটা এমন সব ঘটনা ঘটল যে আর থাকতে ইচ্ছে করছে না। মিত্রদা ফেরার পর সে চারদিন ছুটির অ্যাপ্লাই করেছিল। গ্রান্ট হতে প্রায় পনেরো দিন লাগল।এই ঝামেলা সে ঝামেলা। তারপরেই পালাল সে গঙ্গাপুর থেকে। মুখে সকালবেলার হালকা হাওয়া এসে লাগছে। এখনও ভাল করে রোদ ওঠেনি। মৌ তার অপেক্ষায় আছে। আহ। ভাবতেই মনটা ভাল হয়ে গেল কৌস্তভের।এটা একটা লাইফ হল! আজই ধর্মতলার কে সি দাশের মিষ্টির দোকানের সামনে আসতে বলে দিয়েছে মৌকে। নেমেই

দৌড়তে হবে তাকে। পাশে বসা বিহারি পরিবার, তাদের বাচ্চাটার জানলা দিয়ে পেচ্ছাপ করানো কোনটাই স্পর্শ করছিল না তাকে। মৌ যেন তার অন্তিম স্টেশান। ওর জন্যই সবকিছু এত ভাল লাগছিল তার।

ধর্মতলা পৌছতে মৌকে দেখে এগিয়ে গেল সে। এবার সে আর পুলিশ অফিসার নয়। এক বন্য প্রেমিক।

৭।

এককালে ডায়েরী লিখত কৌস্তভ। আজ আবার লিখতে বসল সে। মনটা আজ খুব ভাল লাগছে। মৌকে নিয়ে সে অনেকক্ষণ গঙ্গার তীরে বসেছিল। তারপর দুজনে মিলে সিনেমা দেখল। সিনেমা দেখল কথাটা বলা ভুল কারণ কিছুই দেখল না। দুজনে দুজনকে আদর করে ভাসিয়ে দিল। মৌ বলছিল "তুমি ছুটি পেতে এত দেরী করলে? যদি আমি অন্য কারও সাথে চলে যেতাম?" কৌস্তভ ওর আঙুল দিয়ে মৌএর ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল "অত সাহস নেই। বুঝলে? তুমি আমাকে ছাড়বে বা ছেড়ে অন্য কারও সাথে পালাবে সেই সাহস তোমার নেই।"

মৌ বলল "সেই সাহস নেই কেন, কাছে পিঠে যাকে পাব তার সাথেই পালাব যদি ছুটি না পাও"।

সেই কথাই লিখছিল ডায়েরীতে হঠাৎ সে যেন একটা শক খেল।

শুয়ে শুয়ে লিখছিল সে। ঈশ। সে এত বোকা! চোখের সামনে সব দেখল, সব শুনল কিন্তু একটুও সন্দেহ হয় নি তার। ফোনটা খাটের পাশেই থাকে তার। লাফিয়ে উঠে কল হিস্টরি দেখা শুরু করল সে। হতাশ হল। আবার মিইয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকল। আবার উঠে ফোন করল কাস্টমার কেয়ারে। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে ফোনটা রাখল সে। মৌএর চারটে মিসড কল এর মধ্যে।

৮।

-আপনি এখনও যাননি সুমিতা দেবী?

-না মানে আমার ছেলের স্কুলের টি সিটা নেওয়া হয় নি এখনও।

-ও। আচ্ছা। কিন্তু আপনাকে যে একবার থানায় যেতে হবে।

-কেন বলুন তো?

-আপনি আর আপনার প্রেমিক আপনাদের এন আর আই বাড়িওয়ালার ছেলে মিস্টার অরিন্দম হালদার আপনার স্বামী শ্রী অসীম দাস মার্ডার কেসে মূল আসামী।

-এ সব কি বলছেন আপনি?

-ওই তো অরিন্দমবাবু এসে গেছেন । বসুন।

সুপুরুষ চেহারার অরিন্দম হালদার অবাক চোখে তাকালেন কৌস্তভের দিকে। "কি ব্যাপার অফিসার?"

কৌস্তভের একটা চাপ আসছিল। মানসিক চাপ।বাড়িওয়ালা বুড়ো আর বুড়ি চেচিয়ে পাড়া মাত করছে। কেন ওর ছেলেকে ধরতে এসছে।পাড়ার লোক ভেঙে পড়েছে বাড়ির বাইরে। বাড়িটা পুলিশ দিয়ে ঘেরা পাশে মিত্রদা থাকা সত্ত্বেও চাপটা তার যাচ্ছিল না। তবে সে আজ এতটাই আত্মবিশ্বাসী যে কোন কিছুই তাকে টলাতে পারছিল না। নাক দিয়ে দুধ পড়া অফিসারটির হঠাৎ যেন উত্তরণ ঘটে গেছে। সেই আত্মবিশ্বাসের সাথেই সে বলল, "আপনার সাথে সুমিতা দাসের সম্পর্কটা ক দিনের অরিন্দমবাবু? আমি তো ইনভেস্টিগেট করে দেখলাম আপনারা অনেকদিন ইভেন সুমিতাদেবীর বিয়ের আগে থেকেই একে অপরকে ভালবাসতেন। আর সুমিতাদেবীর বাবা যে রিটায়ারমেন্টের আগে অবধি এখানেই থাকতেন সে কথাও বেমালুম চেপে গেছিলেন।"

সুমিতা একটু চমকালেন। কিন্তু তবুও চোখ মুখ শক্ত করে রেখেছেন। অরিন্দমের এন আর আই কাঁধটা একটু ঝুঁকলেও মুখে একটা বাঁকা হাসি দেখা দিচ্ছিল মাঝে মধ্যেই। বললেন "তাতে অফিসার কি প্রমাণ হয়? আমি ছিলাম আমেরিকা, সুমিতা ছিল বাড়িতে আর অসীম ছিল স্কুটারে। এতে প্রমাণ হয় কিছু?" কৌস্তভ হাসল "আপনি কি করে বুঝলেন আমি আপনার নামে মার্ডার চার্জ আনব? আমি তো সুমিতাদেবীকে

বলেছিলাম।“ অরিন্দমের আত্মবিশ্বাস তবু টলানো যায় না, “হ্যা কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে অফিসার। আপনি বলুন না কি করে প্রমাণ হয় আমি ওকে খুন করেছি?”

কৌস্তভ বলল, “ফিরোজ মেকানিকের নাম শুনেছেন অরিন্দম? যাকে আপনি অসীমের স্কুটার ঠিক করতে দিয়েছিলেন? ফিরোজ আমাদের বলে দিয়েছে অরিন্দমবাবু যে আপনার নির্দেশে ঘটনার আগের দিন স্কুটারের অ্যাক্সিলারেটার কেবল চেঞ্জ করে দিয়েছিল ও। অসীমবাবু সেদিন অফিস থেকে ফিরতেই ফিরোজ আসে ঘরে। অসীমবাবুকে বলে আরও কাজ বাকি ওনার স্কুটারের। অসীমবাবু জানতেন না কিছুই। বাড়ির গ্যারেজে গাড়ির পুরো বডি খুলে কেবল চেঞ্জ করে ফিরোজ। ইনকম্প্যাটিবল কেবল, তাও হালকা লুজ করা। হয় তারটা পুড়বে, গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে দেবে, নয়ত কিছুটা গিয়ে গাড়ি বন্ধ হয়ে যাবে, আর সেটা যদি রাস্তার মাঝখানে গাড়িটাকে বন্ধ করে দেয় তবে তো কথাই নেই কোন। আমার গাড়িটাও কিছুদিন আগে বিগড়েছিল। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন মাথায় আসে নি। আপনারা ভেবেছিলেন কিছু হলে হল, না হলে আরও ওয়েট করতেন। ফুলপ্রুফ প্ল্যান। কার বাপের ক্ষমতা ধরবে এটা স্রেফ একটা ঠাণ্ডা মাথায় খুন? আর আপনার কপাল দেখুন, আর যদি দু তিন মাস পরে দেশে ফিরতেন তাহলে অ্যাটলিস্ট জেলের হাওয়াটা খেতে হত না। আর সুমিতাদেবী আপনিও কম যান না। অসীমবাবু মারা যাবার পর আমার ফোন থেকেই আই এস ডিটা করে কল অরিন্দমকে “সুসংবাদ” দিয়ে কি ঠাণ্ডা মাথায় কল রেকর্ড থেকে ফোন নাম্বারটা মুছে দিলেন। ভাগ্যে আমার সার্ভিস প্রোভাইডার আমার আগের মাসের কল লিস্টটা আমায় দিতে পারল।“

এন আর আই আর তার প্রেমিকার মুখটা ঝুলে গিয়েছিল। মিত্রদার অ্যাকশান স্কোয়াড কাজ আরম্ভ করে দিল। হাতকড়া পড়ান থেকে শুরু করে সবকিছু।

বাড়িওয়ালা বুড়ো বুড়ির চেঁচামেচিও থেকেছে। কৌস্তভের টায়ার্ড লাগছিল। গত কালই চলে এসেছিল সে গঙ্গাপুরে। এদিক সেদিক সব জায়গায় যেতে হয়েছে ইনভেস্টিগেশানের জন্য। ফিরোজ মেকানিক থেকে শুরু করে সব খবর বের করা সম্ভব হয়েছে খালি কালকের দিনটায়। একদিন তাকে খুব বড় করে দিল। সেই ছোট ছেলেটা যেন আর সে নেই। মিত্রদাও কাঁধ চাপড়ে দিল পরে। বলল "ওপর মহল থেকে ভাল প্রাইজ পাবি। কিপ ইট আপ"।

তবু তার মন খারাপ লাগছিল। বাচ্চাটার জন্যে। ঘরের কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। কোনদিন হয়ত জানা যাবে এই বাচ্চাটাও অরিন্দমের কিন্তু তাতে এর দোষ কি? জীবনের প্রথম রহস্য উদ্ঘাটন কোন আনন্দই দিতে পারল না তাকে। চুপচাপ বেরিয়ে গেল হালদার বাড়ি ছেড়ে।আবার ছুটি লাগবে। ফিরতে হবে মৌ-এর কাছে। এ চাকরি কি না করলেই নয়?